উপেন্দ্রকিশোর সুকুমার সত্যজিতের ছোটদের সেরা পত্রিকা

সন্দেশ

অগাস্ট ২০০৮

সম্পাদক
সন্দীপ রায়

ভৌতিক সংখ্যা

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - জয়ন্ত কর্মকার
স্ক্যান করেছেন - শুভায়ন দত্ত
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

dhulokhela@gmail.com

বেজিং অলিম্পিকে দুই বাঙালী মেয়ে সুস্মিতা সিংহরায়, দোলা ব্যানার্জী

উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার, সত্যজিতের ছোটদের সেরা পত্রিকা

সন্দেশ

তৃতীয় পর্যায় ● বর্ষ ৪৭
জুলাই-অগাস্ট ২০০৮ ● আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪১৫

লীলা মজুমদারের লেখা ফিরে দেখা

আষাঢ়ে ৪

ধারাবাহিক উপন্যাস

অবতার / সত্যজিৎ রায় (রূপান্তর-শঙ্করলাল ভট্টাচার্য) ৫১

নারায়ণকোটের জহরত / অমিতানন্দ দাশ ৬৪

গল্প

রাতের রেলগাড়ি / রমেন গাঙ্গুলী ৭

ঝিমলি-কমলি আর জোড়াগাছতলার ভূত / যশোধরা রায়চৌধুরী ১০

যাত্রী / রূপক চট্টরাজ ১৫

তিনটে ছাগল আর ট্রল ভূত / প্রদীপ কুমার রায় ১৮

চাঁদ সদাগর / জয়ন্তী চক্রবর্তী ২০

ভূতের রাজ্যে গোয়েন্দাগিরি / দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫

বহুরূপী / ভবানীপ্রসাদ দে ৩৪

সেই রাত / লায়লী দাশ ৩৭

জোড়া মৃত্যু রহস্য / অনির্বাণ বসু ৪৭

মিল্টনগঞ্জের শিলটন সাহেব / রাহুল মজুমদার ৫৪

আবছায়াতে / রাকা দাশগুপ্ত ৫৯

প্রবন্ধ

ব্যাপারটা যখন ভৌতিক / সুভদ্রকুমার সেন ২৩

ভূত নিয়ে গবেষণার যন্ত্রপাতি / প্রযুক্তিবিদ ৪৯

কবিতা

নিমগাছ থেকে / অরুণিমা রায়চৌধুরী ৩

নাটক

সুতোর লড়াই / পিনাকী গুহ ৭৩

কুইজ

ঝরঝর বরিষে / সুগত রায় ৭২

হাত পাকাবার আসর

ঋক ধর্মপাল ব্যানার্জী, বৃতি দাশ ৮৫

ছবি এঁকেছেন

সত্যজিৎ রায়, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, অভীক কুমার মৈত্র, সুদীপ্ত দত্ত, ওয়াসিম হেলাল, রাহুল মজুমদার

প্রচ্ছদ

নীতিশ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক

সন্দীপ রায়

সন্দেশ কার্যালয়: ১৭২/৩, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯ থেকে সন্দীপ রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও
কালী প্রিন্টার্স এন্ড বাইন্ডার্স ১০৯বি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯ কর্তৃক মুদ্রিত
স্বত্বাধিকারী : সুকুমার সাহিত্য সমবায় সমিতি লিমিটেড

নিমগাছ থেকে

অরুণিমা রায়চৌধুরী

তোমরা যখন বলো খেলো সব,
বাউন্ডারির রান ডেকে দাও,

আমি তখন মাঠ-কিনারায়
পা দুলিয়ে পা দুলিয়ে,
ইচ্ছে দারুণ যাই মিশে ওই

ইচ্ছে হলেই লাভ কী বলো?
আমার এখন হাত-পা-মাথা

নইলে কেন এক উড়ানে
হঠাৎ যখন বলতে গেলাম,
তোমরা তো কেউ শুনলেই না
ভেদ করে বুক বল ছোটালে

উঃ কী দারুণ ছক্কা সেদিন
ভয়েই মরি, মাথাটা আজ

ভাবছি যখন পা ঝুলিয়ে
অ্যাম্বুলেন্সে কেই বা আমায়

আসলে তো সব ভুলেই যাই

খুব বাঁচাটাই বেঁচে গেলাম
ছক্কার বল লাফিয়ে গেল

কিংবা ক্রিকেট ম্যাচ,
নয় লুফে নাও ক্যাচ।

নিমগাছটার ডালে,
তাকিয়ে থাকি জুলজুলিয়ে,
খেলুড়িদের পালে।

যায় কিরে সব পাওয়া,
বুক-গলা সব হাওয়া।

সেদিন বিকেলবেলায়,
—নাও না আমায় খেলায়?
একটু চেয়েও দেখলেই না
ছুঁড়লে নেহাৎ হেলায়।

মারল কোন এক বীর!
হবেই বা চৌচির!

নিমগাছে মগডালে
নেবে হাসপাতালে?

মাথা-ফাথার নেই যে বালাই,

যখন মাথা ফুঁড়ে,
পাখির মতো উড়ে।।

লীলা মজুমদার

আষাঢ়ে গল্প

বলতে পার এসব ঘটতে পারে না, সমস্ত বানানো কথা। তাই যদি বল, মানুষদের কোন কথাটাই বা বানানো নয়? তাদের পূর্ব-পুরুষদের অন্য বনমানুষদের থেকে খুব তফাৎ না থাকলেও, বুদ্ধি নিশ্চয় বেশি ছিল, তাই জানোয়াররা প্রায় আদিম অবস্থাতেই থেকে গেছে, কিন্তু মানুষরা তখনি গুহার দেওয়ালে ছবি আঁকত আর এখন ফ্যাশানেব্‌ল শিল্পীরা যদিও প্রায় সেই রকমই আঁকে— অন্যরা কত বিচিত্র শিল্পকর্ম করেছে, গান তৈরি করেছে, গান তৈরি করেছে, বই লিখেছে, তা একবার ভেবে দেখ! বলা বাহুল্য এসব আমার বক্তব্য বিষয় নয়। আমি শুধু বলতে চাইছি 'ঘটতে পারে না' বলে কোনো কথা নেই। আজ পর্যন্ত না ঘটলেও, অনেক অদ্ভুত ব্যাপার যে-কোনো দিন ঘটতে পারে।

উত্তর কলকাতার একটা পুরনো পাড়ার সারি সারি পোড়ো বাড়ির মধ্যে অনেক সময় একেকটা বড়লোক পাড়া চোখে পড়ে। সেখানে দেখা যায়, অনেকগুলো পাঁচতলা সাততলা আধুনিক বাড়ি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আজ-কাল অবিশ্যি পাঁচতলার বেশি তৈরি করতে দেয় না, কিন্তু তাই বা কম কিসের? আবার ঐ রকম আট দশটা বাড়ির পর হয়তো একটা ছোট পার্কের মতো, তার উল্টে দিকে পরপর কয়েকটা পোড়োবাড়ি তাদের বিগত দিনের ঐশ্বর্য নিয়ে পরস্পরকে ঠেকো দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের বেশির ভাগই খুব বেশিদিন টিকবে না। ভয় নেই, ভেঙ্গে পড়বে না, বেজায় শক্ত গাঁথুনি। রোদে পাকানো ছোট ছোট ইঁটের তেরি। সেগুলোকে যত্ন করে খুলে এক পাশে গুছিয়ে রাখা হয়, নাকি হাজার হাজার টাকা দাম। মালিকরা মুখিয়ে থাকে, যদি কোথাও কোনো গুপ্তধন বেরিয়ে পড়ে, তাতে ক্রেতাদের কোনো দাবি থাকবে না। দলিলে পষ্ট করে লেখা আছে।

অবিশ্যি আজ পর্যন্ত দু-চারটে সত্যিকার মরা টিকটিকি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি আর ভিৎ খুঁড়ে ফেলার পর একটা করে ছোট ইস্পাতের বাক্সে বার হয় একটা সোনার তৈরি খুদে নকল টিকটিকি। আবার একটা বাড়ি থেকে নয়টা দ্বিতীয় শ্রেণীর রত্নও পাওয়া গেছিল। তাই নিয়ে অসুবিধা ছিল না। গোল বাধল ২১ নং নিয়ে। তার মালিক নিখোঁজ। চার কাঠা জমির প্রায় সবটা জুড়ে একটা চারতলা বাড়ি। পুরনো ঝুরঝুরে পলেস্তারা খসে পড়ছে কিন্তু পাথরের মতো মজবুত দেয়াল। ছাদেরও চিলেকোঠা ছাড়া দুটো ঘর, কলঘর, রান্নাঘর। তাছাড়া একটুখানি খোলা ছাদ, সেখান থেকে ইটের সিঁড়ি বেয়ে সবার ওপরের ছাদে চড়া যায়। আজকাল হয়তো এমন বাড়ি তৈরি করতেই দেবে না। আপাততঃ সমস্যা তৈরি করা নিয়ে নয়, ভাঙা নিয়ে। নিখোঁজ মালিকের ওয়ারিশ তাঁর রোগা ফ্যাকাশে স্ত্রী, তাঁকে সবাই ডাকে জ্যাঠাইমা আর খোঁড়া ছেলে, বকুল। প্রত্যেক তলায় দুজন ভাড়াটে, তারা নিজেরা ঘরদোর সারায় সুরোয় আর মাস কাবারে ৭৫ টাকা করে ভাড়া দিয়ে যায় এবং খুশি হয়ে জ্যাঠাইমার হাটবাজার করে দেয়। একজন পেশাদার পালোয়ান, সে বকুলকে রোজ পড়ায় আর ব্যায়াম করার। জ্যাঠাইমা নলিন কবরেজের মেয়ে, সকলের বিপদে আপদে টোটকা ওষুধপত্র বলে দেন। ফলে বাড়িটা একটা পুরনো অথচ সুরক্ষিত দুর্গের মতো। ভয় দেখিয়ে, শাসিয়ে, গাল দিয়ে, কাউকে তোলা গেল না। যে লোকটা ভূতের ভয় দেখাতে এসেছিল, পালোয়ান তাকে এমনি পেটাল যে জ্যাঠাইমার কাছ থেকে ছাগলাদ্যঘৃত এনে লাগাতে হল। পালোয়ানের নাম ভবতোষ; সে একতলার সামনে দিকে থাকে, পিছন দিকে তার ব্যায়ামের ইস্কুল। তার কাছে জাঠাইমা ভাড়া নেন না।

এদিকে ক্রেতারা শেষ পর্যন্ত অন্যভাবে না পেরে স্রেফ লোভ দেখিয়ে বাকি সাত ভাড়াটে তুলে দিল। তারা প্রত্যেকের পকেটে পাঁচ হাজার টাকা ফেলে, হাসতে হাসতে যাবার সময়ে বলে গেল, 'একশো বছর সবাই শুনে আসছে এ বাড়িতে গুপ্তধন আছে। তোমরাও বাছা সেই আশাতেই

এতগুলো টাকা ঢাললে। আমরা কি আর খুঁজতে বাকি রেখেছি! একটা শুকনো ব্যাংও কোথাও নেই।'

সেই দিন সকাল বেলায় ভবা পালোয়ান নিচের সব ঘরে তালা দিয়ে উপরে চাবি এনে বলল, 'কী করে তোমাদের চলবে, জ্যাঠাইমা?' জ্যাঠাইমা বললেন, 'কেন, পাখিদের যিনি খাবার যোগান, তিনি খাওয়াবেন।' ভবা কাষ্ঠ হেসে বলল, 'হ্যাঁ, তা হলেই হয়েছে! যথেষ্ট খাবার জিনিস বানাতে পারেন তিনি, কিন্তু খায় অন্য লোকরা আর বাকি লক্ষ লক্ষ লোক উপোস করে মরে যায়।' ঠিক এই সময়ে খট্‌খট্ করে ছোট ছাদের দরজাটা নড়ে উঠল।

বকুল দরজা খুলে দেখে একটা লোক পুঁটলি বগলে হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। পালকের মতো পাৎলা শরীর, ঝিনুকের মতো গায়ের রং, ন্যাড়া মাথা, পরনে সাদা কাপড়, গায়ে ধুপধূনোর গন্ধ। সে বলল, 'আমি হাজার টাকা দিয়ে গোটা বাড়ি এক মাসের জন্য ভাড়া নিয়ে, কিছু গবেষণা করব, জ্যাঠাইমা। যদি তোমার আপত্তি না থাকে।' জ্যাঠাইমা বললেন, 'বাছা, আমার আপত্তি করার মতো অবস্থাই নয়। তবে আমার এই ঘর-কটি বাদ।' তাই শুনে জিব কেটে লোকটি বলল, 'সি-কী কথা! আমার সে এই ছাদের ঘরগুলো না হলে গবেষণাই হবে না। বাকি গোটা বাড়ির সবটা জুড়ে তোমরা থেকো। তক্তাপোষ ছাড়া তোমাদের আসবাবপত্র নামিয়ে নিও, খালি ঐ তাকের ওপরকার পুরনো বই পত্রিকার গাদা আমি যত দাম বল, তাই দিয়ে কিনে নেব। ওগুলো আমার গবেষণায় লাগবে। জ্যাঠাইমা অবাক হয়ে বললেন, 'ওর জন্য আবার দাম নেব কেন বাছা? বৃদ্ধ শ্বশুরমশাইদের ঐ এক শখ ছিল, ছাপা কাগজ দেখলেই কিনতেন। এখন খালি ইঁদুরদের কাজে লাগে, ও তোমাকে উপহার দিলাম' ভবা পালোয়ান এখানে বাধা দিয়ে বলল, 'সে কী কথা জ্যাঠাইমা? ছেলেটার ভবিষ্যতের কথা ভাববে না, উনি যখন নিজের থেকে দিতে চাইছেন। তাছাড়া তুমি গেলে ওকে দেখবে কে?' জ্যাঠাইমা বললেন, 'কেন? আকাশের পাখিদের যিনি দেখেন, তিনি দেখবেন।'

তাই শুনে পাৎলা লোকটি খুশি হয়ে বলল, 'আহা, তাঁর কি আর হাতে এত সময় আছে যে নেমে এসে তোমার ছেলেকে পালবেন। ধরে নাও তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন। মিনি মাগনার দান নেওয়া আমাদের বারণ।' এই বলে ছোট্ট একটা মুগার তৈরি থলি জাঠাইমার পায়ের কাছে ফেলল। ঠুং করে শব্দ হয়। জ্যাঠাইমা সেটি তুলে ধন্যবাদ জানাতে গেলে লোকটি মহা অপ্রস্তুত, 'আ ছি ছি, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম! আমি ওনাদের সেরেস্তায় সামান্য কাজ করে ধন্য হই। ওতে যা আছে তাই দিয়ে একটা বাড়ি কিনে ফেলো।' ভবার দিকে ফিরে বলল, 'আহা, বলই না, সেই কী প্রকল্পের কথা। আমি কি ছাই অত বুঝি। সত্যি কথা বলতে কী সমস্কৃত ছাড়া আর কিছু পড়তেই পারি না। তাই বইপত্রগুলি আমার থলিতে ভরে নিয়ে যাব।'

বকুল কাছে এসে বলল 'পুনর্বাসন প্রকল্প, মা ঐ যে ইস্কুলের মাঠের ওপারে সে সুন্দর সব নতুন বাড়ি হচ্ছে, তার কথা বলছেন বোধ হয়। আমার খোঁড়া পা নিয়ে ছেলেরা হাসাহাসি করে।' লোকটি বোধ হয় একটু চটে গিয়ে বলল, 'কিসের খোঁড়া? একটু মনের জোর করে ঐ সিঁড়ি দিয়ে ওপরের ছাদে উঠে আবার নেমে এসো তো।'

বকুল ঘাবড়ে গেল, 'পড়ে যাব যে!' আহা, মনের জোর-ই সব। চেষ্টা করেই দেখ না!' রেগেমেগে বকুল এক দৌড়ে ওপরে উঠে, এক দৌড়ে নেমে এসে, মায়ের পায়ে পড়ে কেঁদে কেটে একাকার কাণ্ড করল। সেই মুহূর্ত থেকে বকুলের খোঁড়া পা ভালো হয়ে গেল।

লোকটি ততক্ষণে ঘরে ঢুকে তক্তাপোষের কোণায় পা ঝুলিয়ে বসে ভবাকে দিয়ে তাক থেকে বইপত্র নামাচ্ছে। চারদিক ধুলোয় ধুলোময়, তাই ভবা থেকে থেকে হাঁচছে, লোকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে। তখন বকুল আর জ্যাঠাইমাতে মিলে চারতলার রান্নাঘরটা সাফসুফ করে, ওপর থেকে বাসনপত্র নামিয়ে আনলেন, জ্যাঠাইমা খিচুড়ি চাপালেন। আসবাবের মধ্যে একটা নড়বড়ে পড়ার টেবিল, টুল, মাদুর, জলচৌকি, দুটি ছোট ছোট তোরঙ্গ। দেখতে দেখতে ভবা সব নামিয়ে দিল। লোকটির নাম নাকি মুন্সী, সে তক্তাপোষে তার জিনিসপত্তর সাজিয়ে দরজায় শিকলি তুলে কাজে লেগেছে।

ভবা বলল, 'মানুষটি একটু অদ্ভুত হলেও বড়ই ভালো। আমাদের এদিককার কিছু খাবে না। নাকি ওদের কারখানায় তৈরি নানা রকম গুটি বড়ি সঙ্গে আছে। আর কলের জল ছাড়া কিছু পানও করে না। ওপরে যেতে আমাদের মানা করেছে। দরকার হলে, নিজেই ডাকবে।' বকুল তো অবাক! কাজ? কী কাজ করেন উনি জানতে ইচ্ছে করে। আমার পা-টা তো এক কথায় সারিয়ে দিলেন। নাকি মনের জোরে হল। আমার মনের জোরটোর নেই। চোদ্দ বছর বয়স, তবু কেউ টিটকিরি দিলে কান্না পায়। মনে জোর ওঁরি।

দিনরাত সাড়াশব্দ নেই, জ্যাঠাইমা ভেবে আকুল হতেন, 'ওরে ভবা, যা না একবার দেখে আয়। মরে থাকলেও যে টের পাব না। আহা বড় ভালো মানুষটা! এতটুকু লোভ নেই। ভাড়ার টাকাগুলোও সব আগাম দিয়ে দিল!' ভবা পালোয়ান ভয়ে কেঁচো, 'ও বাবা! ওঁকে চটাবার সাহস

নেই আমার। বিশেষ করে বারণ করেছেন। হয়তো কোথাও গিয়েও থাকতে পারেন, দামী দামী যন্ত্রপাতি রেখে। একটাও নষ্ট হলে কী বলব? ও চিন্তাও মনে আনবে না।'

জ্যাঠাইমা বললেন, 'বেরোবার তো এই একটাই পথ। সদরের দরজার ভিতর দিয়ে তালা। চাবি আমার কাছে। তুই বাজারে গেলে একবার খুলে দেয় বকুল, ফিরে এলে আবার দিয়ে যায়। তা হলে সে যাবে কী করে।'

ভবা বসে পড়ে বলল, 'এসেছিলেন কী করে?' ব্যস্, কারো মুখে কথা নেই। সে যাই হক, তার পরদিন সন্ধ্যায় লোকটি ভবাকে ডেকে অনেক অদ্ভুত কথা বলে শেষে বলল, 'আমার কাজ শেষ। সব বই গুছিয়ে থলিতে ভরেছি। আজ আমাকে ফিরে যেতে হবে। তোমাদের কাছে যা পেলাম তার তুলনা হয় না। তুমি জ্যাঠাইমাকে আর বকুলকে ডেকে আনো, তাদের দুটো কথা বলে যাওয়া উচিত।'

শুনে জ্যাঠাইমার কী মন খারাপ! উপরে এলে মুন্সী তাঁদের আদর করে তক্তাপোষে বসিয়ে বলল, 'জ্যাঠাইমা, অচেনা অদ্ভুত একটা লোককে তোমরা যে সমাদরে রেখেছিলে, তার মূল্য হয় না। এমন আমি ভাবতে পারিনি। আমার দিক থেকে শুধু এটুকু বলে যাচ্ছি, তোমরা আমার মান বাঁচালে। আমাদের সেরেস্তায় কিছু হারালেই গুপ্ত আমাকে ধরেন। তা তাঁর জনপরি-সংখ্যানের খাতাটার অনেকগুলো পাতায় কে বা কারা কালি ঢেলেছে। তাই দেখে চিতু স্যারের রাগ দেখে কে। ঐ পাতাগুলো আমাক আবার লিখে দিতে না হলেও, যেখান থেকে পারি নামের তালিকার যতটা সম্ভব জোগাড় করে দিতে হবে। ' বকুল থাকতে না পেরে বলল, 'ও দাদা, সে যে কোটি কোটি হবে।' 'তা, কী করতে পারি বল। কোটি কোটি নাম তো হবেই, এদিকে যুগে যুগে জন্মেছেও তো পরাদ্ধকে-পরাদ্ধ। প্রত্যেকের নাম আছে চিতুগুপ্তের খাতায়, নামের গায়ে সাল তারিখ নোট যে কত, তা আর কহতব্য নয়। হ্যাঁ, ভালো কথা, দশ লাখ দিয়ে এ বাড়ি বেচে দিলে, ভালো বই মন্দ হবে না। এখানে সুখে শান্তিতে থাকতে পারবে না। নতুন পাড়ার ৫ নং টা তোমাদের নামে লিখেছি আমার নোট বইতে। আচ্ছা, চলি।'

এই বলে ছোট্ট পুঁটলিটি তুলে পা বাড়াল। জ্যাঠাইমা ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'বই নিলে না?' মুন্সী থলির মুখ খুলে দেশলাই বাক্সের মতো ছোট ছোট গোটা চল্লিশ বাক্স দেখিয়ে হেসে বলল, 'এই যে, আলো দিয়ে ছোট করে নিয়েছি। যেমন ছিল, চ্যাপ্টা আরশুলো সুদ্ধু ছোট্ট হয়ে গেছে, কিছু বাদ যায়নি। আমাদের সেরেস্তায় আবার বড় করে নেওয়া হবে।' তারপর ছোট্ট একটা বাঁশি বেলুন বের করে ফুঁ দিতেই সেটা ফুলতে ফুলতে এই বিশাল হয়ে গেল। তখন বাঁশির ফুটো দিয়ে টুক করে ভিতরে ঢুকে, বাঁশিটা টেনে নিল। দেখতে দেখতে বেলুন উড়ে আকাশে মিলিয়ে গেল।

আষাঢ় ১৩৯৪

ছবি: সত্যজিৎ রায়

ছেঁড়া খোঁড়া বইটা লাল কোরা কাপড়ে বাঁধান। সেটা ছিল নিষিদ্ধ আলমারীর ওপরের তাকে।

কি করে কি জানি নফরচন্দ্র তার খোঁজ পেল। বয়েস তখন তার বারো পেরয় নি।

সাবেকি আমলের বাড়ি। সব ঘর তত খোলামেলা নয়। নফরচন্দ্রের শোবার ঘরও তাই। সেটা তার পড়ার ঘরও বটে। একটু একটেড়ে।

সবাই যখন অঘোর ঘুমে অচৈতন্য নফরচন্দ্র সেই বইখানা নিয়ে পড়তে বসে তার আপন ঘরে রাত দুপুরে একেবারে একা একা। ক্ষয়ে আসা মোমবাতির ক্ষীণ আলোয় তার পড়ার টেবিলের পরিসরটুকুই আলোকিত। সে ঘরে তখন আলোর চাইতে আঁধারের অধিকারই প্রবলতর। চারিধার নিস্তব্ধ। শুধু হলঘরের বড় ঘড়িটার টিক টিক। আর শোনা যায় নিজের হৃৎপিন্ডের ওঠাপড়ার লাব-ডাব শব্দ। আবহ সঙ্গীতের মত এর সঙ্গে মেশে অতিদূর সমুদ্রের পাড়ে তালে তালে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের গুড় গুড় শব্দের রেশ।

ছেঁড়া খোঁড়া বইটা তার কাছে দুর্বার আকর্ষণের বস্তু। যদিও সহজবোধ্য নয় তার কাহিনীসূত্র। বইয়ের শিরোনাম—রাতের রেলগাড়ী। পঞ্চাশ নম্বর পাতায় পাতাজোড়া একখানা কালোসাদা ছবি। কালোরই প্রাধান্য তাতে। মোটে তার ভাল লাগে না সেটা দেখতে। একটা অনামা অস্বস্তি, একটা অজানা আশংকা তাকে আচ্ছন্ন করে ছবিটার দিকে মনঃসংযোগ করলে।

ছবিটায় নির্জন রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়ান একমাত্র একজন লোক। একমাত্র একটি আলোর উৎসের নীচে দাঁড়িয়ে আছে পেছন ফিরে। মনে হয় তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ষ্টেশনের অদূরে একটা টানেলের অন্ধকারে কালো মুখের দিকে। ভঙ্গিতে চাপা উত্তেজনার ছাপ। যেন ভয়ানক এক বিপর্যয়ের আশংকায় সে ত্রস্ত। কিন্তু বইয়ের ভেতর অন্যত্র বা ছবির পাদটীকায় এ-রকম কোন ইঙ্গিতে ছিল না।

বলতেই হবে বালক নফরচন্দ্র বিলক্ষণ কল্পনাপ্রবণ।

শেষ পর্যন্ত ওই ছবির পাতাটা সে আলপিন দিয়ে আগের পাতার সঙ্গে এমনিভাবে জুড়ে দেয় যাতে ছবিটা আর দেখাই না যায়।

তার নিদারুণ ইচ্ছে এক নিঃশ্বাসে গোটা বইটা একবার পড়ে ফেলে। তা কিন্তু হয়ে ওঠে না কোনমতেই। পড়তে পড়তে পঞ্চাশের পাতায় আসার আগেই সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে নফরচন্দ্র বালক বয়েস থেকে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হল আর সে-বইয়ের কথা বেমালুম ভুলেও গেল।

কার্যসূত্রে অধিক রাতে সে এসে পড়ল অখ্যাত এক রেল ষ্টেশনে। দিনে-রাতে মাত্র দুটো গাড়ী আসে দু'দিক থেকে। কাছাকাছি কোন লোকালয় নেই। তরাই অঞ্চল। পাহাড়, নদী, জঙ্গলের ভূমিকাই প্রধান।

প্ল্যাটফর্মের একদিকে একটা টানেল। বেশী দূরে নয়। মুখে তার জমাট বাঁধা অন্ধকার। গোটা প্ল্যাটফর্মে টিম টিম করে জ্বলছে একটা মাত্র আলো। আর কি আশ্চর্য! সেই আলোটার ঠিক নীচে টানেলের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন মাত্র যাত্রী।

হঠাৎ করেই মনে পড়ল সেই লাল কোরা কাপড়ে বাঁধাই বইটার কথা, আর তার পঞ্চাশতম পাতায় সেই ছবি।

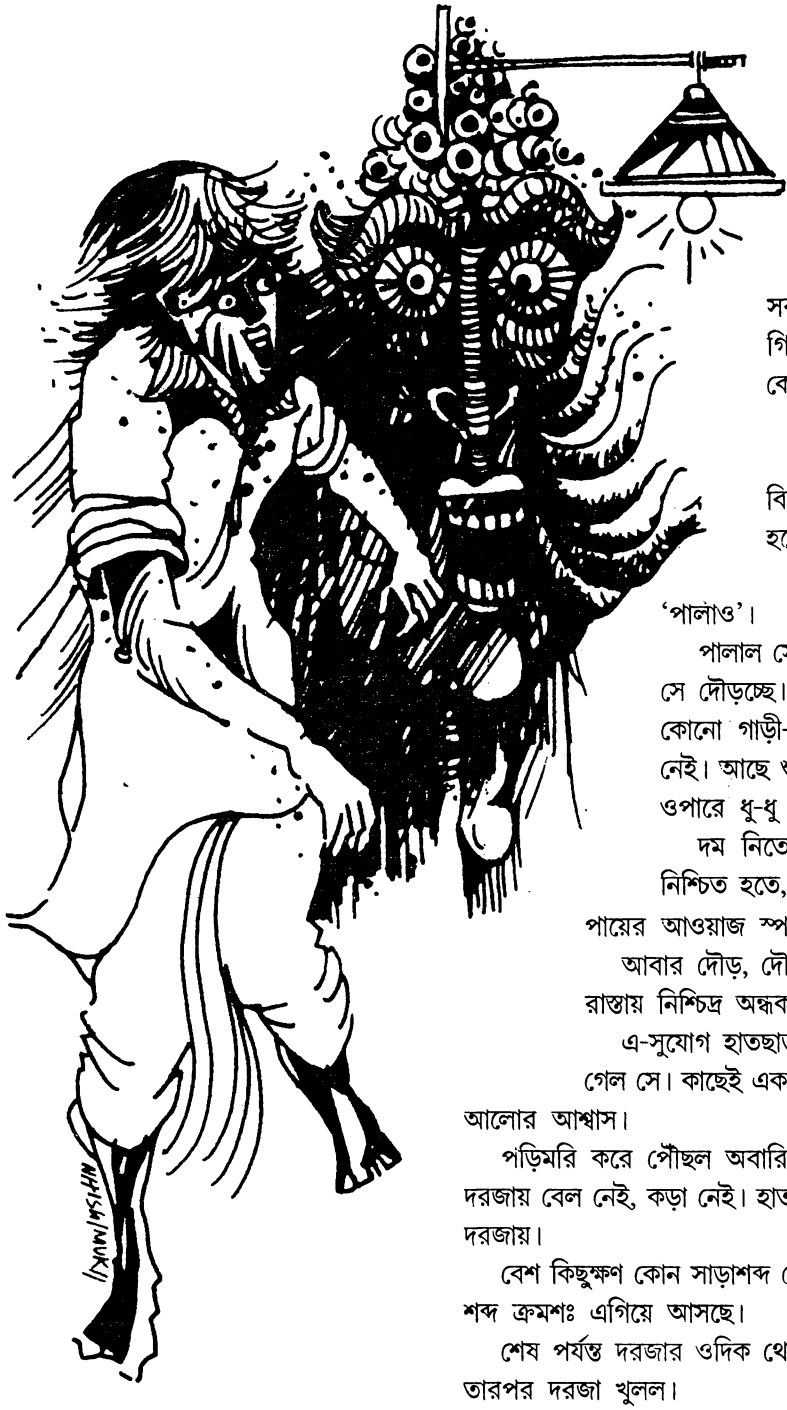

নফরচন্দ্র এখন সেই ভয়কাতুরে বালক নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতার অনিবার্য উত্তাপে কল্পনার ভাণ্ডার উড়ে পুড়ে নিঃশেষ।

জানা-অজানার দ্বন্দ মেটাতে নির্ভীক সিদ্ধান্ত নিতে সে ইতস্তত করল না। সেই নিঃসঙ্গ যাত্রীর মুখোমুখি হবে সে। কি বলবে তাকে তাও মনে মনে ঠিক করে নিল। বলবে যে-কথাটা সে জেনেছে স্টেশন মাস্টারের কাছ থেকে। ট্রেন আজ বেশ কিছুটা দেরিতে আসছে।

প্রথম পদক্ষেপেই টের পেল তার সাহস কমে আসছে। হাতের তালুটায় জমেছে ঘাম। আঙুলগুলো মুঠো হয়ে আসছে। ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় দ্রুতপায়ে সে লোকটিকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল।

তারপর আচমকা পেছন ফিরে সরাসরি তাকাল তার দিকে। কথা বলতে গিয়ে মুখের কথা তার মুখেই রয়ে গেল, কোন শব্দই বের হল না।

সেই লোকটি তো সে নিজেই।

লোকটি অপলক তার দিকে তাকিয়ে আছে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে। যেমন হয় অবাক হয়ে আয়নার দিকে তাকালে।

ভেতর থেকে অচিরে নির্দেশ এল, 'পালাও'।

পালাল সে তৎক্ষণাৎ। দৌড়চ্ছে, দৌড়চ্ছে। উর্দ্ধশ্বাসে সে দৌড়চ্ছে। পথে কোন লোক নেই, প্রাণী নেই, নেই কোনো গাড়ী-ঘোড়া। চাঁদের আলো ছাড়া অন্য আলো নেই। আছে শুধু পথের দু'ধারে গাছের সারি আর তার ওপারে ধু-ধু প্রান্তর।

দম নিতে একটু থামল সে। শুধু দম নিতে নয়, নিশ্চিত হতে, কেউ কি অনুসরণ করছে। করছেই তো। পায়ের আওয়াজ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে।

আবার দৌড়, দৌড়, দৌড়। সামনে অনেক গাছের জটলায় রাস্তায় নিশ্চিদ্র অন্ধকার।

এ-সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে গেল সে। কাছেই একক একখানা বাংলো বাড়ি। একটা জানালায় আলোর আশ্বাস।

পড়িমরি করে পৌঁছল অবারিত মাঠ পেরিয়ে সে-বাংলোবাড়ির সদরে। দরজায় বেল নেই, কড়া নেই। হাতমুঠো করে সজোরে ঘা দিতে লাগল সদর দরজায়।

বেশ কিছুক্ষণ কোন সাড়াশব্দ নেই ভেতর থেকে ওদিকে পেছনের পায়ের শব্দ ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে।

শেষ পর্যন্ত দরজার ওদিক থেকে কারুর আসার আওয়াজ শোনা গেল। তারপর দরজা খুলল।

যে খুলল সে নিঃসন্দেহে পুরুষমানুষ, মধ্যবয়েসী। কিন্তু তার মাথা-মুখ ঘোমটায় ঢাকা, হাতে আড়াল করা একটা মোমবাতির আলো।

দরজার একপাশে সরে গিয়ে ইঙ্গিতে ঘরের ভেতরে ঢোকার আহ্বান জানাল। ভেতরে ঢুকতে বিলম্ব হল না নফরচন্দ্রের।

আশ্রয়দাতাও অবিলম্বে দরজা বন্ধ করল। আর তারপর আলো নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকল। যন্ত্রচালিতের মত নফরচন্দ্র তার পেছন পেছন যেতে লাগল।

সিঁড়ি বেয়ে তারা দোতলায় একটা ঘরে ঢুকল। একটা টেবিলের ওপর আলোটা রেখে সেই পথ প্রদর্শক সুড়ুৎ করে অন্য একটা দরজা দিয়ে সে-ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নফরচন্দ্র টেবিলের সামনের চেয়ারটায় ধুপ করে বসে পড়ল।

খানিক বাদে দেখতে পেল টেবিলে রাখা আলোটার পাশেই আছে একখানা বই। বইটা ছেঁড়াখোড়া লাল কোরা কাপড়ে বাঁধান।

কাঁপা কাঁপা হাতে তুলে নিয়ে দেখল বইয়ের নাম-রাতের রেলগাড়ী। প্রথম পাতায় একটা কালির ছোপ যেমন ছিল তাদের বাড়ির বইয়ের প্রথম পাতায়।

ভয় নয়, এক অতৃপ্ত কৌতূহল তাকে মনে করিয়ে দিল গোটা বইটা তো পড়াই হয় নি।

এ সুযোগ সে সদ্ব্যবহার করবে। এখন তো আর সে ছোট্টটি নেই যে কাহিনীসূত্র তার অবোধ্য হবে।

কিছু আবেগে, কিছু প্রত্যাশায় সে পড়তে আরম্ভ করল।

রাতের রেলগাড়ী

যাকে নিয়ে এই গল্প ছেলেবেলায় হঠাৎ পেয়ে যাওয়া একটা বইয়ে একটা বিশেষ পাতায় একটা বিশেষ ছবি দেখে সে ভারী ভয় পেয়ে যায়। বড় হয়ে অবিশ্যি সে-ছবির কথা বেমালুম ভুলে যায়।

বয়স যখন তার পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই কি এক বিচিত্র যোগাযোগে সে নিজেকে আবিষ্কার করল প্রায় জনহীন এক রেল ষ্টেশনে প্রায় মাঝরাতে। কিছু কিছু বিশেষ খুঁটিনাটি তাকে মনে পড়িয়ে দিল ছেলেবেলার সেই ভয়-পাওয়ান ছবির কথা। ঠিক সেটার মতই গোটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ান একমাত্র একজন লোক। পেছন ফিরে সে দাঁড়িয়ে আছে একমাত্র একটি আলোর উৎসের ঠিক নীচে। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ অদূরে একটা টানেলের দিকে। এগিয়ে গিয়ে তার মুখোমুখি হতেই ভারী ভয় পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল সে। অবশেষে আশ্রয় পেল রাস্তার ধারে একটা বাড়িতে। আশ্রয়দাতা তাকে পৌঁছে দিল দোতলায় একঘরে। সেখানে সে দেখতে পেল তারই জন্য অপেক্ষা করে আছে একখানা বই। বইটা ছেঁড়াখোঁড়া লাল কোরা কাপড়ে বাঁধান। ঠিক ছেলেবেলায় বইটার মত। এটারও নাম—রাতের রেলগাড়ী। ভেতরের লেখাও একই রকম।

এ-গল্প যাকে নিয়ে লেখা সে-ও ছেলেবেলায় হঠাৎ পেয়ে যাওয়া একটা বইয়ে একটা বিশেষ পাতায় একটা বিশেষ ছবি দেখে ভারী ভয় পেয়ে যায়।

* * * * * * * * *

এ-গল্প ঘুরে ঘুরে এমনি বৃত্তাকারে চলতেই থাকে। শেষ নেই এর। এ-গল্পের নায়কের এমনি বৃত্তাকারে চলমান গল্পের হাত থেকে রেহাই নেই, নিস্তার নেই। কিন্তু যখন গল্পটা তৃতীয়বার রাস্তার পাশে বাড়িটার জায়গায় এসে পৌঁছল তখন নফরচন্দ্রের মনে একটা আশংকা দানা বেঁধে উঠল।

ঘড়িতে তখন বাজে ঠিক রাত বারোটা এমনি সময় নফরচন্দ্র শুনতে পেল একটা দরজা খোলার আওয়াজ। আর সাথে সাথেই ঘরে ঢুকল তার আশ্রয়দাতা। তার মুখে এখন নেই কোন ঘোমটার ঢাকা। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে তাকে।

তার সন্দেহ, তার আশংকা আর বাস্তব মিলেমিশে একাকার। আশ্রয়দাতাও সে নিজেই।

এ অলাতচক্র ভেদ করার উপায় মাত্র একটাই। সে উপায় অবলম্বন করতে বিন্দুমাত্র দেরি করল না নফরচন্দ্র। আশ্রয়দাতার কণ্ঠনালী সে মরণান্তক জোরে চেপে ধরল।

আর ঠিক তেমনি জোরেই আশ্রয়দাতা চেপে ধরল নফরচন্দ্রের কণ্ঠনালী।

এবার যা হতে বাকি ছিল তাই ঘটল।

রাতের রেলগাড়ীতে চেপে বসল নফরচন্দ্র।

তার হাতে বহুব্যবহারে জরাজীর্ণ লাল কোরা কাপড়ে বাঁধান পুরোণ একখানা বই, পড়বার মত করে মেলে ধরা।

(বিদেশী গল্পের অনুসরণ)

ছবি: নীতিশ মুখোপাধ্যায়

ঝিমলি-কমলি আর জোড়াগাছের ভূত

যশোধরা রায়চৌধুরী

সেবারে ঝিমলি আর কমলির গরমের ছুটি পড়ল একেবারে শীতের মধ্যে।

সেদিন শেষ ইশকুল হল ছুটির আগে, ফিতে দিয়ে জড়ানো বেড়াবিণুনির উপরে মাফলার জড়াতে জড়াতে ঝিমলি কমলিকে বলল, জেঠুকে বলবি তো, আমাদের যাতে একদিন মামার বাড়ি নিয়ে যায়?

কমলি কালো কুটকুটে হোয়ে যাওয়া নীল সোয়েটারের বোতাম আটকাতে আটকোতে বলল, ধেৎ জেঠু তো হাঁটতেই পারে না রে! মাকেই বলব। মা দিব্যি পারবে। একবার বাসে উঠে পড়লেই তো হল।

বন্ধুদের সঙ্গে মাসখানেক দেখা হবে না, ভাবলেই মন খারাপ। কিন্তু দিদিমণিদের বকা থেকেও তো ছাড়ান। যতখুশি জোড়াগাছের তলায় বসে ফল খাও, আর জঙ্গলের গন্ধ শুঁকে, আওয়াজ শুনে, বাতাস খেয়ে থাকো। এ জঙ্গল তো আর যে সে জঙ্গল না, শেওড়া অশত্থের ঘন বন। গোল গোল পাতা, চিকরি চিকরি পাতা, কত না ঝোপঝাপ সেখানে। জঙ্গলের দিকে খেলতে যাবার আগে ঝিমলি কমলিরা গেল বিধুখুড়োর কাছে। বটতলার কথা-ঘরে চাটাই পেতে কথকতা করে বিধুখুড়ো। সে কথকতার খুব দর তো গাঁয়ের সব্বার কাছে, রেডিও বলো, টিবি বলো, সবার কাছে সবই তো বিধুখুড়ো।

বিধুখুড়ো, সে তুমি বুড়োই হও আর বাচ্চাই হও, বিধুখুড়ো সব্বারই বিধুখুড়ো। সেই শনের নুড়ি চুল দোলাই গায়ে বিধুখুড়ো বটতলার কথা-ঘরে বসে বসে দু হাঁটুর ফাঁকে মাথা রেখে কেবলই বলে, হবেনি, হবেনি, শাপ নেগেচে যে। আরো যাও উড়োজাহাজ করে আকাশের নীল ফুটো কর। আরো যাও ঠান্ডা মেশিন চালায়ে বাতাসে কালো ধোঁয়া ছেড়ি সব মলয়ানিল শুষে লও। আরো জলের ভেতর ক্যামিকিল ঢালো! এবার পোকিতি মা পোতিশোধ নেতেছেন। লও ঠ্যালা!

ঝিমলিরা তো এই দেখছে কদিন। গত শীতের মাঝবরাবর কি বিষ্টি কি বিষ্টি। আর এই গরমের মধ্যে হু হু ঠান্ডা বাতাস। দেশশুদ্ধু লোক নিমুনিয়া আর ম্যালোরির জ্বরে খাবি খাচ্ছে। আবার বর্ষাকালে দেখবে কাঠফাটা রোদ্দুর। গেল বছর পুজোর সময়ে কী ভীষণ বন্যা গেল যে। বলে নাকি মরুভূমির দেশেও নাকি বন্যা হচ্ছে। সারা পৃথিবী জুড়েই এই হ্যাঙ্গাম।

ঝিমলি-কমলিরা যে জায়গাটায় থাকে সেটা না শহর না গ্রাম। ঝিমলি কমলি থাকে ওদের জেঠুর কাছে, জেঠু

ছিল মিলিটারির সৈনিক। দেশ বাঁচাতে গিয়ে একখানা পা খুইয়েছে। আর বাবাটা তো সেই কবেই উধাও হয়ে গেল কাশ্মীরে। জেঠু বলে দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে। জেঠুর একফালি জমি, ধান আর সূর্যমুখী চাষ হয়। সূর্যমুখী ফুলগুলো পৌষমাঘে ফনফনিয়ে বড় হয় তারপর ফাল্গুন-চত্তির মাসে রোদে জ্বলে নুয়ে পড়ে। তারপর মধ্যের কালো গোল ডেলাটা ঘষে ঘষে মা সেই বীজগুলো বার করে উঠোনে মেলে দেয়। কিন্তু এবার তো যা বিষ্টি, গাছ পাতা সব জলে ভিজে একশা। দেশপাড়াগাঁয়ে আবার বাদলা হলে খুব ঝক্কি। রাস্তাঘাট কাদার কাদা। তবে গাছপালা থাকলেই সে দেশপাড়াগাঁ, তা তো না। একদিন কলকাতার চিড়িয়াখানা গিয়েছিল, ও বাবা মনে হল কলকাতার মধ্যেই একখানা দেশপাড়াগাঁ ঢুকে আছে!

তো এই জয়গাছিটাও দেশপাড়াগাঁ, আবার দশমিনিট গেলেই দেখবে ওই যে হাই রোড, বড় রাস্তা, গাড়ি যাচ্ছে। পানের দোকান, আলুর গুদোম, এস টি ডি ফোনের বুথ আর ঠান্ডার বোতলের দোকানও আছে পর পর। আর সরু লম্বা পেলাস্টিকের খাপে রঙিন জলভরা বরফজমানো পেপসি তো আছেই। গরমে শীতে খুব চলে, ওই মিত্তিরকাকারই তো বাড়িতে বানানোর ব্যাপার

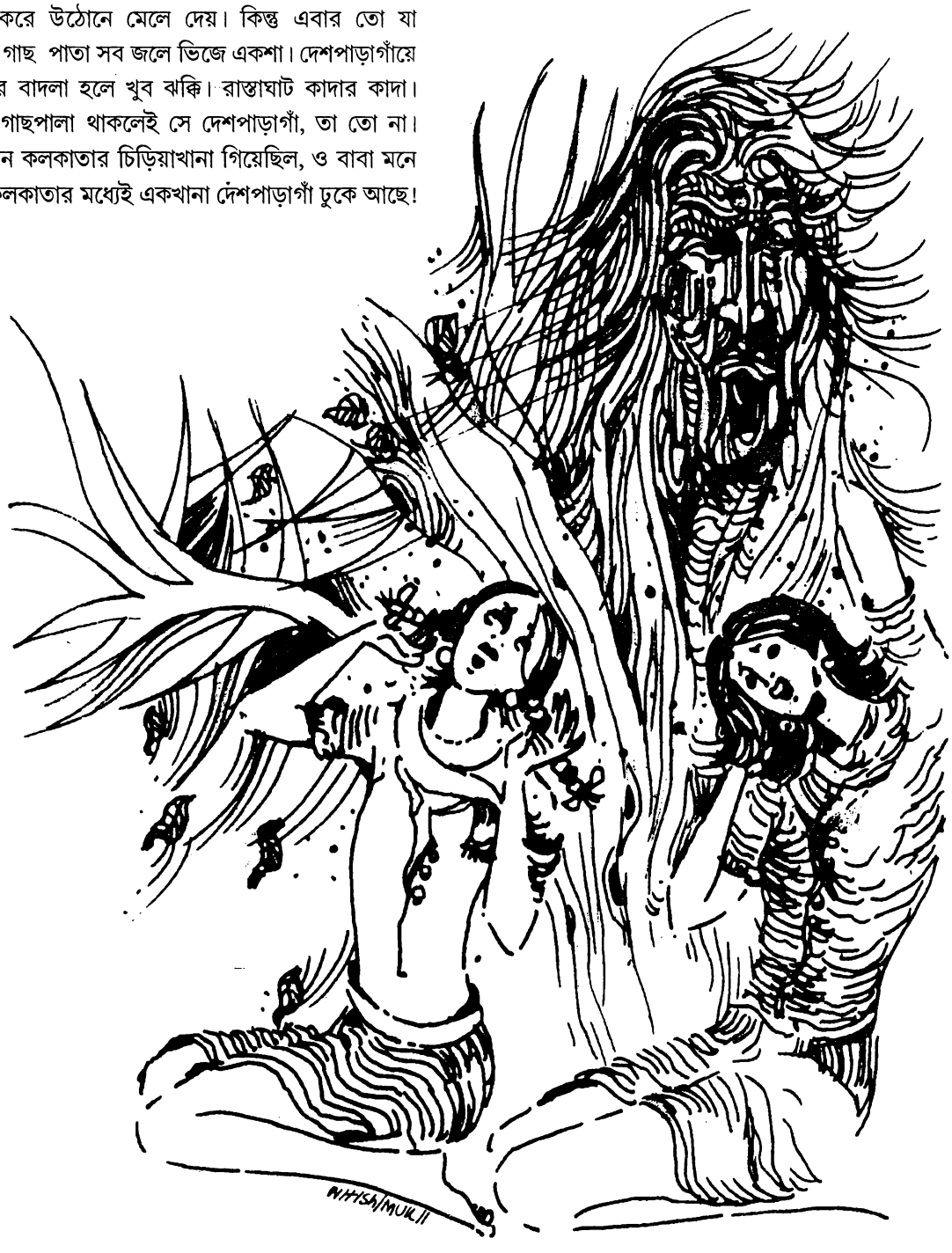

আছে। কমলিরা যায়, জেঠুর জন্য বিড়ি আনতে, নিজেরা আমপাচক আর আলুচিপস কিনে আনে মাঝে সাঝে। তারপর জেঠুর জিনিস দিয়ে এসে নিজেরা গিয়ে বসে জোড়াগাছতলায়। এক্কেবারে ওদের নিজের গাছতলা সেটা, ভারি সুন্দর এই ছায়াঘেরা জায়গাটা। একেবারে নিরিবিলি। একটু জঙ্গল জঙ্গল জায়গাটা। বিশেষ কেউ যায়না।

পরশুদিন আমপাচক কিনে এনে জোড়াগাছতলায় বসেছিল ঝিমলি কমলি। গাছতলাটা ভারি অদ্ভুত। একে তো এই গাছটা যে কেবল জোড়া, তাই না, এ গাছের রকমসকম ভারি অদ্ভুত। গোটা গাঁ খুঁজে এমন আশ্চজ্জি গাছ খুঁজে পাবে না কেউ। কাউকে বলেও না ঝিমলি-কমলি। একটা অশ্বত্থগাছের সাথে কী একটা ফলের গাছ এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে পাতা ডাল আর আলাদা করাই যাবে না। শুধু অমন ফল কেউ কোনোদিন চোখে দেখেছে কিনা সন্দেহ।

ছোট ছোট লাল লাল ফল পড়ে গাছটা থেকে সারাদিন ধরে। সারা বছর ধরে, শীত নেই গ্রীষ্ম নেই, একরকমের পাকা পাকা ফল ওই গাছের থেকে পড়বে। না, সারাক্ষণ পড়ে না। যখন ঝিমলিরা থাকে, তখন পড়ে। যখনই ওর তলায় আসে ওরা, এসে বসে, টুপ টুপ টুপ! ফল পড়তে শুরু করে। যেন গাছটা কথা বলছে ওদের সাথে। এখনো তাই হল। আমপাচকের ঠোঙা খুলে মুখে দুটো পাচক পুরে দুজনে যেই গাছের গুঁড়ির কাছে ওই বেশ আঁকাবাঁকা সিংহাসনের মতন উঠে যাওয়া জায়গাটায় পা ঝুলিয়ে বসেছে, অমনি শুরু হল। টুপ টুপ টুপ।

আর কী মিষ্টি সেই ফলগুলো। গরমের দিনে একটা ফল মুখে দিলেই মুখের ভেতরে কেমন ঠান্ডা আর শরবৎ শরবৎ ভাব ছড়িয়ে যায়। এক্কেবারে ওই ঠান্ডা বোতলের শরবতের থেকেও যেন ভালো। একটার পর একটা খেয়ে যায় ঝিমলিরা। কোনো ক্লান্তি আসে না। আর এখন যেমন হুটোপুটি হাওয়া, গলা শুড়শুড় করে, নাক ফ্যাচফ্যাচানি লেগে যায় বরফ বরফ জামধরা শীতে, এখন মুখে দিলে গলার ভেতরে আস্তে আস্তে নেমে আসে একটা আদুরে গরম আরাম। যেন আলিচাচার চায়ের দোকানের আদা দেওয়া চায়ের সাথে তালমিছরির ডেলা নেমে আসছে।

আর একটা অদ্ভুত জিনিস হয়, রোজ। সারা দুপুর গাছের তলার ছায়ায় বসে বসে ওরা সেই আওয়াজটা শোনে। গুব গুব গুব। কোথায় যেন, গাছটার বেশ উপরের দিকে, ডাললতাপাতা মিশমিশে যেখানে একাকার, সেখানে ওই মনকেমন করা আওয়াজটা হয়। মাঝে মাঝে থেমে যায়, আবার শুরু হয়।

প্রথমবার আওয়াজটা শুনে পাখির ডাক ভেবেছিল ওরা। কিন্তু না। কিচিরমিচির করে কয়েকটা পাখি ফল খায় বটে, কিন্তু মানুষ দেখলে তারা কাছে আসে না। আর ওই ডাকটা এমন ভারি আর গুমগুমে, যে ওটা পাখির ডাক হতেই পারে না। তাহলে কি বাস্তুসাপ? ধেৎ, সাপ তো ডাকতেই পারেনা। আর যদি কোনো ভয়ের জন্তু হয়? ধেড়ে গোসাপ, গিরগিটি, কাঠবেড়ালি এসব কিছু তো হবে না। যদি ভুত হয়?

আওয়াজটা ভূতুড়ে হলেও, এতোদিন শুনেও সত্যি বলতে কি, একটুও ভয় করেনি ওদের। কেন কে জানে? গুব গুব আওয়াজটা শুনে শুনে, সত্যি বলতে কি, ওদের এত অভ্যেস হয়ে গেছে, যে ওটা না শুনলেই এখন একটু অস্বস্তি হবে। হয়ত সেজন্যেই, ঝিমলি কমলি কখনো বড়দের কাউকে এ কথাটা বলতে চায়নি। মা তো শুনলেই কানের গোড়ায় পেঁচিয়ে দিত, আর কস্মিনকালেও আসতে দিত নাকি এ জঙ্গলে?

আজ কিন্তু একটা অন্যরকম কান্ড হয়ে গেল। ওরা গিয়ে বসতেই গাছের তলাটা সরসর করে একরকমের হাওয়া দিল। গায়ের উলজমা সোয়েটারটা আরো একটু বুকের কাছে টেনে জড়োসড়ো করে দুতিনটে ফল তুলে মুখে পুরল ঝিমলি। বাঃ, এখন তো বেশ যেন আমলা আর জোয়ানের মতন সোয়াদ আসছে ফলটা থেকে। গলা চনমন করে উঠছে। কিন্তু টুপ টুপ ফল ঝরার আওয়াজ হলেও পেছন থেকে গুব গুব আওয়াজটা তো নেই? কেমন যেন থমথমে চারদিক।

আজ কী হল বলতো কমলি? সেই শব্দটা কই?

আমিও তো তাই ভাবছি, দিদি। মা গো, গা কেমন ছমছম করছে। কমলিও দু তিনটি লাল ফল তুলে মুখে দিয়েছে।

দুজনেই উপরের দিকে তাকায়, চোখের দুপাশে হাতের আড়াল করে দেখতে চেষ্টা করে কী হচ্ছে ওখানে।

অনেক ওপরে তখন কী হচ্ছে সেটা বোঝার সাধ্যি কি আর ওদের আছে? সেটা তো মানুষের জ্ঞানগম্যির বাইরে।

আসলে ওই লাল ফলের গাছটার ওপরে গুব গুব আওয়াজটা করে গাছের মা। না, সে আর বেঁচে নেই। এই গাছটা যখন অনেক ছোট্ট, এক্কেবারে চারাগাছ, তখনই এক ঝড়ের রাতে মা-গাছটা মড়মড় করে উপড়ে পড়ে গিয়েছিল। পাশের চারা বাচ্চাটার জন্য মায়ের মনটা তখন খুব কামড়াতো। গাছভূত সেই থেকে পাশের অশ্বত্থগাছটার উপরে বাসা করে অপেক্ষা করে, কবে তার ছানা বড় হবে, কবে তার দু চারটে করে ডালপালা গজাবে, কবে

হাত আর আঙুলের মত অনেক অনেক ডালে পাতায় ছড়িয়ে যাবে, খুলে যাবে ছোট্ট গাছ। সেই গাছভূতই বুদ্ধি দেয় অশ্বত্থগাছটাকে, তার ডাল আর শিকড় দিয়ে বাচ্চাটাকে জড়িয়েমড়িয়ে কোলের কাছে টেনে নিতে। সেই থেকেই জোড়াগাছের উদ্ভব।

এখন, ছোট গাছ বড় হবার পরপর, মায়ের ভূতটাই থাকে গাছের উপরে। সেই রোজ আওয়াজ করে গুব গুব গুব। আর টুপ টুপ করে লাল ফলগুলোও সে-ই ফেলে ঝিমলি-কমলি এসে নিচে বসলে।

এখন হয়েছে কি, সেদিন মা গাছের ভূতের খুব মন খারাপ। চুল এলিয়ে দিয়ে বসে কাঁদছে। সবুজ দড়িদড়ার মত যে লতাগাছগুলো দেখা যায়, গাছের গা দিয়ে নেবে এসেছে, সেগুলোই তো ভূত মায়ের চুল কিনা। তা সেই লতাগুলো বেয়ে বেয়ে এক মস্ত বড় সারি দিয়ে অনেক পিঁপড়ে হাঁটাচলা করে রোজ। ছোট গুবরে পোকা, শুঁয়োপোকাও সাথে থেকে। তো সেই পোকামাকড়েরা হঠাৎ কেমন করে জানি উধাও হয়েছে। মা তাকিয়ে দেখে, একটা পোকাও আর নেই। দেখেই মায়ের হু হু করে কান্না আসে। তারপর মা দেখল, পিঁপড়েদের যে মস্ত ঢিবিটা ছিল গাছের তলায়, পশ্চিমদিকটাতে, সে ঢিবিটাই একেবারে উধাও হয়েছে। সেখানে পড়ে আছে ভাঙা ইঁটের টুকরো, গোলা চুণ আর বালিমাটির একটা মস্ত পাহাড়। নিশ্চয়ই মানুষের কান্ড। কাছেই মিত্তিরদের বড় বাড়িটা পুরনো হয়ে গিয়েছে বলে ওটা ভেঙে মিত্তিরদের ছেলে বড় বাড়ি বানাচ্ছে কিনা, সেই সব বাড়ি তৈরির জঞ্জালই এনে এখন জড়ো করছে এই গাছের তলায়।

দেখেই তো কান্না পেয়ে গেছে মা গাছ-ভূতের। আর সে অমনি গুবগুব সুখের আওয়াজ থামিয়ে কাঁদতে বসেছে। ফল পড়ছে টুপ টুপ, আর মায়ের কান্না হয়ে পাতা ঝরছে ঝুপ ঝুপ। পিঁপড়েরা যেমনি উধাও, তেমনি উধাও বাকি সব জন্তু আর পাখিরাও। চারদিক শুনশান। ঝিমলি আর কমলি তাই ভাবছে, কী হলটা কি এই জায়গাটার? এত চুপচাপ, আর এতো ঝুপঝাপ পাতা ঝরার শব্দই বা কেন?

এমন সময় হঠাৎ মানুষের গলার আওয়াজ পেয়ে চমকে ওঠে ঝিমলি ঝিমলি। আঁৎকে উঠে, এই রে, ওদের এই গোপন ডেরাটার খবর কে পেয়ে গেল আবার।

দেখে কি, ঝোপঝাড় ঠেলে সরিয়ে আসছে এদিকেই, মিত্তিরদের ছেলে সজলকাকা আর নাতি, টুকলু। সঙ্গে দুটো হুমদো মত লোক, দুজনে মিলে ধরে নিয়ে আসছে একটা মস্ত বড় লম্বাটে কালো জিনিশ। ঝিমলি কমলি ভয় পেয়ে দৌড়ে ঢুকে যায় গাছের গুঁড়ির কাছে কোটরের মত খোঁদলটার ভেতরে। উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করে, কি হচ্ছে।

দুটো লোকের হাতে একটা বিরাট করাত দেখে চমকে ওঠে ঝিমলি।

ঠান্ডা আর পাতলা কালো রঙের করাত, একদিকে খাঁজকাটা-কাটা দাঁত বের করা, অন্যদিকটা চকচকে মসৃণ। এইয়া বড়। দুজন লোক দুদিকে ধরে গাছের গুঁড়িতে ঠেকাবে, তারপর একবার বাঁয়ে একবার ডাইনে টানাটানি করে ঘ্যাঁশঘেঁশিয়ে হেঁইও হেঁইও করে কাটতে পারে।

ফিসফিস করে কমলিকে বলে : একিরে, করাত কেন? তাহলে কি জোড়াগাছ কাটা পড়বে নাকি?

টুকলুকে বলতে শোনে, বাবা, বাবা, আজ জোড়াগাছের কোটরে কী আছে দেখা যাবে, তাই না? গুপ্তধন আছে, না গো?

চুপ কর। কত সাপখোপ যে বেরোবে আজ, কেন তুমি এলে বলোতো আমার সাথে?

না বাবা, আমি দেখব বাবা, গাছ কাটা দেখব।

গাছ তো কাটতেই হবে। গাছ না কাটলে এখানে বাড়ি বানানো হবে কি করে বলো? আর কী বিচ্ছিরি জঙ্গল হয়ে গেছে জায়গাটা বলোতো? যতো পোকামাকড়ের ইঁদুর ছুঁচোর আড্ডা হয়েছে!

নাঃ, এ হতে দেওয়া যায় না। কি ঘটতে চলেছে, বুঝতে পেরে ঝিমলি কমলি দুই লাফে গাছের সামনে বেরিয়ে এসে চিলচীৎকার জুড়ে দেয় :

এ্যাই এ্যাই, কী করছ তোমরা এখানে? কী করছ?

চমকে গিয়ে চার পা পিছিয়ে যায় সজলকাকা, টুকলু।

তারপর ভালো করে দেখে, কুঁচকোন ভুরু, রাগিরাগি মুখ, লম্বা বিনুনি, ফ্রক আর রোগাসোগা দুজোড়া পায়ের দাপাদাপি দেখে, চিনতে পারে ঝিমলি কমলিকে।

আরে, তোরা! এখানে কী করছিস রে? কী দুরন্ত ডানপিটে মেয়েদুটো রে! দাঁড়া দেখাচ্ছি তোদের। ডাকব নাকি তোদের জ্যাঠাকে? কান ধরে টেনে নিয়ে যাবে তোদের।

কোমরে হাত দিয়ে দুই বোন এবার বুক চিতিয়ে দাঁড়ায়।

এইয়ো, খবরদার বলছি। এটা আমাদের গাছতলা। এখানে কেউ হাত দেবে না বলে দিচ্ছি। করাত এনেছো কেন?

ঝিমলি কমলির তেজ দেখে ভীষণ অবাক হয়ে গেল লোকগুলো। হতভম্বই হয়ে গেল বলা যায়। বাব্বা, কী সাহসি মেয়েগুলো! নিজেদের মধ্যে বিড়বিড় করে কীসব বলাবলি করতে লাগল।

তারপর সজলকাকু এগিয়ে এসে মিষ্টি করে ওদের বলল : শোনে মা, এখানে তো বাড়ির পুরদিকের দেউড়িটা পড়বে কিনা, তাই এ গাছ কাটা পড়তেই হবে। কী সন্দুর পুকুর কাটা হবে, দেউড়ির গায়ে রোয়াক হবে, বাঘবন্দি খেলার খোপ, কিতকিতের খোপ সব কাটা হবে, তোদের খেলার কত পোষ্কার একটা জায়গা হয়ে যাবে। মিউনিসিপালিটির প্ল্যান স্যাংশন করে এসে গেচে যে মায়েরা!

ভাবটা যেন লবেঞ্চুশ দিচ্ছে। কিন্তু কমলি ঝিমলি কি আর তাতে ভোলে। দুজনেই কোমর বেঁধে বলল:

না না হবে না। কিচ্ছু হবে না। বইতে লেকা আছে, গাছ কাটা অন্যায়। ভীষণ দুষ্টু কাজ। তোমরা এ গাছ কাটতে পারবে না।

হুমদো লোকগুলো করাত হাতে এবার এগিয়ে এসে বলল : শোনো কতা। বলচে বাবু মিনিচিপালির পেলান ছ্যাঙ্কন হয়ে গেছে, তবু শোনে না।

বলেই, জামার আস্তিন গুটিয়ে, লুঙ্গিটা কষে বেঁধে, হেঁইয়ো করে যেই না গাছের গায়ে করাত ঠেকানো, ঝিমলি কমলি দুজনেই লাল লাল কোঁচড়ভরা ফল একমুঠো মুখে দেয়, আর একমুঠো ছুঁড়ে দেয় ওদের দিকে। মুখের ভেতর মিষ্টি রসটা ঢুকতেই কোথা থেকে ওদের চোখের জ্যোতি বেড়ে যায়। ওরা কটমট করে তাকায় করাতটার দিকে।

আর লোকগুলোর গায়ে ফল লাগতেই ওরা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে কুঁকড়ে সরে যায়, যেন গায়ে জলবিছুটি লেগেছে, কী ইলেকটিরিই লেগেছে।

আর করাতটা ঝিমলি কমলির চোখের নিভয় জ্বলজ্বলে তাকানোর আঁচে একেবারে গলে যায়, যেন জলে ভেজা পাঁপড়। ন্যাত করে নেতিয়ে পড়ে কালো লোহার করাতটা, আর এবড়োখেবড়ো হয়ে যায় গা-টা। সবজে সবজে হয়ে যায় ওটার রঙও। তারপর সেটা সরসর করে বনের মধ্যে পালিয়ে যায় একটা মস্ত অজগর- সাপ হয়ে।

কান্ড দেখে সজলকাকা ওঁ ওঁ করে আর একটু হলেই অজ্ঞান হয়ে যেত, কিন্তু টুকলু এই যাদু দেখে হাততালি দিয়ে যেই হেসে ওঠে, আর লাফিয়ে লাফিয়ে নাচতে শুরু করে, কোনোরকমে নিজেকে সামলে সুমলে ভয়ে বাড়ির দিকে দে দৌড়। হাত ধরে টেনে টুকলুকেও নিয়ে যায় হিড়হিড় করে। হুমদোদুটো তো আগেই পালিয়ে গিয়েছিল।

এবার ঝিমলি কমলির হাত ধরাধরি করে একটু নেচে নেবার পালা। আর ওপরে বসে মা-গাছ-ভুত, যে নাকি এই যাদুটা ঘটিয়েছিল, সে তো খিলখিল করে হেসেই খুন। টপাটপ ঝিমলি কমলির মাথার বড় বড় হলদে কলকে ফুল ঝরাতে থাকে।

কমলিরা জানেই না, এ গাছে কোনোকালে ফুল হত না, আজ কী করে ফুল এল। তবে এটা বোঝে যে এ গাছে যে গুব গুব করে সাড়া দিত, সে আবার ফিরে এসেছে। কারণ আবার সেই চেনা আওয়াজটা ফিরে এসেছে। মন ভালো হয়ে যায় সেই আওয়াজে।

তারপর দিন থেকে কোনো মিস্তিরি, কোন কাকুটাকু কেউ আর জোড়াগাছতলা মাড়ায় নি। ওদের বাড়ির ছক পাল্টে গিয়ে অন্যরকম হয়ে গেছে। জোড়াগাছের অনেকটা দূর দিয়ে একটা পাঁচিল তুলে দিয়েছে সজলকাকু। এদিকে আর মাড়াবে না ঠিক করেছে। শুধু সাপখোপ না, ও গাছে ভূতপ্রেতও আছে, সেটাও বলে বেড়ায় সবাইকে।

আর জেঠু, সে যেই জানল ঝিমলি কমলি এমন এক বিদঘুটে কান্ড ঘটিয়েছে, প্রথমে ভীষণ রেগে গিয়ে মারবে বলে একটা বিরাশি সিক্কার চড় তুলেও হো হো করে হেসে ফেলে বলল, আমার ভাইঝিদুটোর এত এলেম!! ভাবতে পারি না। আমি বলে এখন ঠ্যাং ভাঙা সেপাই, পেনসানের ওপর নিভভর, কিন্তু এককালে তো একা হতে দুশমনের সাথে লড়তাম। তোদের বাপ তো লড়তে লড়তেই মল রে!

আর বিধুখুড়ো? দু হাত তুলে আশীর্বাদ করল ঝিমলি কমলিকে। বেঁচে থাক মায়েরা। দেশের মুখ উজ্জ্বল কর। হেথাকার একটা গাছও আর কাটা না পড়েন, দেখিস তোরা। তোরা যদি চেষ্টা করিস, আবার বর্ষার সময়ে বিষ্টি আর গরমকালে গরম ফিরি আসতি পারে। শীতের দিনে কাঁচা আমের চাটনি খেতে বড্ড ভয় করে রে!!!

কোমরের ধুতির প্যাঁচ থেকে বিধুখুড়ো নিজের বহুকালের জমানো দুটো রাণীর মুখ আঁকা গিনি দিয়ে দিল দুজনকে। আর গাঁ-গঞ্জের সব্বাইকে ডেকে ডেকে বলল ওদের কান্ডটা সাতকাহন করে।

এখন রোজ ঝিমলি কমলি গাছতলায় বসে ফল খায়। আর রোজ ফল পড়ে টুপ টুপ টুপ। রোজ গাছের ওওওই ওপরদিকটাতে কে যেন ডাকে, গুব গুব গুব।

ছবি: নীতিশ মুখোপাধ্যায়

যাত্রী

রূপক চট্টরাজ

ডিসেম্বর মাস। শীতটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। একটা কাজে এসময় আমাকে রাঁচী যেতে হয়েছিল। কাজটা ছিল খুব জরুরী। রাঁচীতে শীতটা একটু বেশি পড়ে। কাজে কাজেই কোট সোয়েটার মাফলার ও সঙ্গে একটা কম্বল নিয়ে নিয়েছিলাম। রাতের ট্রেন। রাঁচী পৌঁছাবে পরদিন সকাল সাতটায়। আমার কোনও স্লিপার বার্থ রিজার্ভ করা ছিল না। সেজন্য রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে একটু আগেই হাওড়া স্টেশনে পৌঁছালাম। খবর নিয়ে জানলাম রাঁচী যাওয়ার গাড়ীতে কোনও বার্থ খালি নেই। সারারাত হয় দাঁড়িয়ে নয় বসে আমাকে যেতে হবে এই ট্রেনে। তারপর দিনের বেলা কাজ সেরে ফের রাতের ট্রেনে ফিরতে হবে। সেখানে যে কি হবে কে জানে।

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু যেতে হবে তাই বাধ্য হয়ে একটা অর্ডিনারি টিকিট কেটে নিয়ে হাওড়া স্টেশনে ১৩নং প্লাটফর্মের একটা ফাঁকা বেঞ্চে গিয়ে অ্যাটাচীটা পাশে নামিয়ে রেখে বসলাম। এমন সময় একটা কুলি এসে আমাকে বলল, ``বাবু, রাঁচীর ট্রেনে খুব ভিড় হবে। আপনাকে গাড়িতে তুলে দেব।''

আমি ওকে বললাম, ''তুমি আমাকে একটা বাঙ্কের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে?''

ও বলল, ''হ্যাঁ বাবু, সব ব্যবস্থা করে দেব। কিন্তু বিশটাকা লাগবে।''

আমি ওর কথায় তখন রাজি হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পর ট্রেনটা প্লাটফর্মে দিল। ট্রেনটা ঢুকতেই কুলিটা আমাকে বসতে বলে ছুটে গিয়ে একটা কম্পার্টমেন্টের বাঙ্কে আমার শোবার জন্য একটা জায়গা দখল করে নিল। মিনিট কয়েক বাদে যাত্রীদের ওঠার হুড়োহুড়ি থেমে গেলে কুলিটা গাড়ি থেকে নেমে এসে আমাকে নিয়ে ওই বাঙ্কে শুইয়ে দিল। আমি তখন ওর প্রাপ্য টাকা ওকে দিয়ে বিদায় করলাম।

কিছুক্ষণ পর কুলিটা আবার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে আমাকে বলল, ''বাবু, এ গাড়ির পিছনে মানে একদম শেষে একটা ফাঁকা কোচ জুড়ে দিয়েছে। আপনি বরং ওই কম্পার্টমেন্টে চলুন, আমি ওখানে একটা স্লিপার বার্থ রিজার্ভ করে দেব।''

আমি তখন খুশি হয়ে অ্যাটাচী হাতে নিয়ে ওই কুলিটার সঙ্গে ওখানে গিয়ে একটা স্লিপারবার্থ রিজার্ভ করে লাফিয়ে কম্পার্টমেন্টে ওঠে পড়লাম।

তখনও ট্রেন ছাড়তে মিনিট কুড়ি বাকি। কিন্তু দেখলাম এই কম্পার্টমেন্টে আমি ছাড়া তখনও আর কোনও যাত্রী নেই। মনে মনে ভাবলাম হুট করে এখানে চলে এসেই

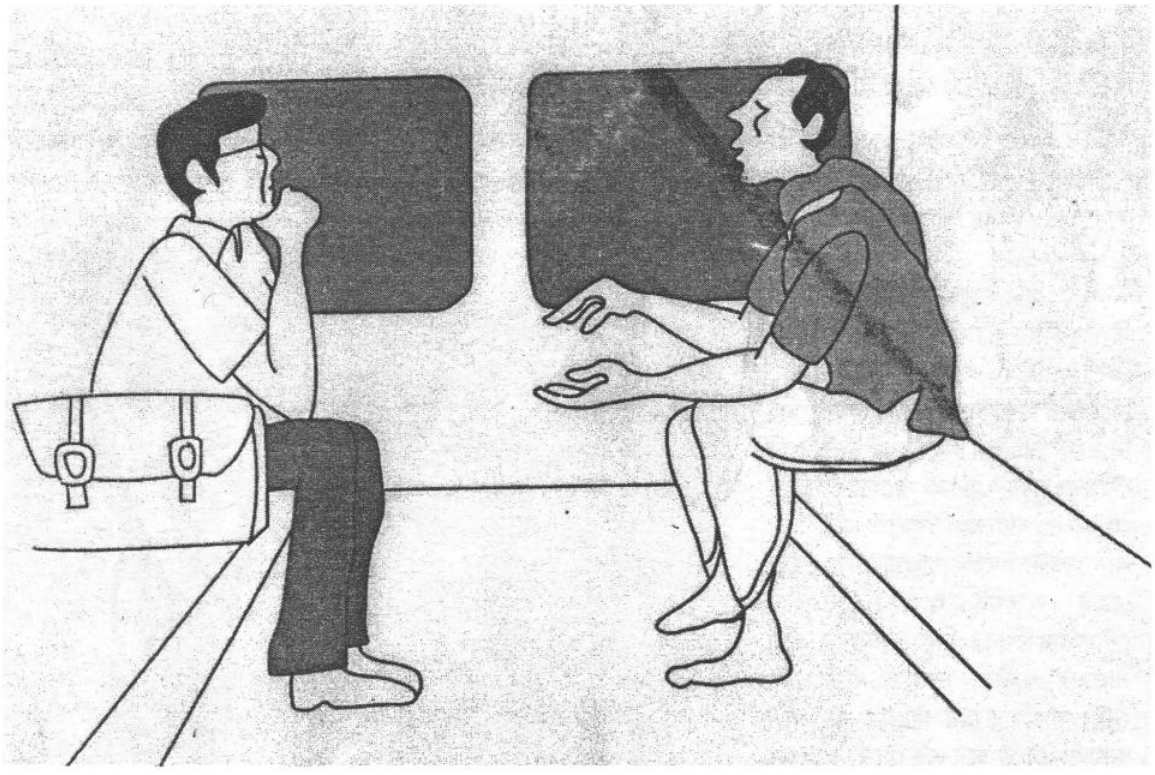

ভুল করেছি। আগের কম্পার্টমেন্টে বেশ লোকজন ছিল। দু-একটা কথা তো বলা যেত!

ট্রেন ছাড়ার মিনিট দু-তিন আগে দেখলাম হুড়মুড় করে জনা সাতেক লোক কম্পার্টমেন্টে এসে উঠল। ওদের দেখে আমি একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। ওরা ওঠে বেডিং প্যাটরা নিয়ে অন্যপ্রান্তের ফাঁকা জায়গায় সকলে চলে গেল। আবার ঠিক ট্রেন ছাড়ার মুহূর্তে দেখলাম দুজন যাত্রী উঠল। একজন আমার সামনে লোয়ার বার্থে এসে বসল। আর অপরজন অন্যদিকে এগিয়ে গেল।

ট্রেন চলতে শুরু করলে দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দেওয়া হল। আমার সামনে বসা লোকটি বলল, "জানেন, এই কম্পার্টমেন্টটা এত ফাঁকা কেন?"

আমি বললাম, "না মশাই। আমিও তো এটাই ভাবছি। আপনি জানেন নাকি?"

—"জানবো না আবার! শুনুন তবে। গত মাসে এই ট্রেনটাকে পিছন থেকে একটা ট্রেন এসে ধাক্কা মারে। তখন এই ট্রেনটা একটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল। সিগন্যাল না দেওয়া ট্রেনটা ছাড়তে দেরি করছিল। আসলে কিছুক্ষণের জন্য গোটা সিগন্যাল সিসটেমটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। যদিও স্টেশন ইঞ্জিনিয়াররা খুব তৎপরতার সঙ্গে সিসটেমটা চালু করে দিয়েছিল মিনিট কুড়ির মধ্যে। কিন্তু তার আগেই যা ঘটার তা ঘটে গেল।"

—"তা, আপনি কি ছিলেন ওই ট্রেনে?"

—"ছিলাম বৈকি? তা না হলে আর বলছি কি করে। এই দেখুন না, আমার হাতে-পায়ের কাটাছড়া এখনো শুকোয় নি, কেমন সব হাড়গুলো দেখা যাচ্ছে।"

—"ওমা, তাই তো! আপনার হাত-পা, না কঙ্কাল দেখছি? তারপর! তারপর কি হল শুনি?"

—"কি আর হবে! বেশ কিছু লোকজন মারা গেল। এ খবর তো খবরের কাগজে বেরিয়ে ছিল। দেখেন নি বুঝি?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা মনে পড়ছে বটে।"

—"এ কারণে তারপর থেকে এই পিছনের কম্পার্টমেন্টে কেউ বার্থ রিজার্ভ করে না। এখনও দেখা গেছে যে এইখানে রিজার্ভেশন থাকলেও অনেকে টিকিট ফেরত দিয়ে দিচ্ছে। কেউ বা আবার টিটি বাবুর মধ্যস্থতায় অন্য কম্পার্টমেন্টে চলে যাচ্ছে।"

—"ও তাই দেখছি এটা ফাঁকা। আপনি বুঝি প্রায়ই যাতায়াত করেন?"

—"আমার ব্যবসা আছে। তাই তো আমাকে প্রায়ই যাতায়াত করতে হয়। তা আপনি কি করেন?"

—"আমি যাচ্ছি অফিসের কাজে। আগামীকাল কাজ সেরে আবার রাতের ট্রেনেই ফিরে আসব।"

—"আমিও তো কাল রাতে এই ট্রেনেই ফিরব।

তবে আমি এখন রাঁচীতে যাচ্ছি না। তার আগেই মুড়ি স্টেশনে নেমে যাব। আমার ওখানেই কাজ।"

—"তা, ওই স্টেশনে কখন পৌঁছাবে এই ট্রেনটা?"

—"ভোর পাঁচটা নাগাদ। অবশ্য যদি ট্রেনটা লেট না করে। শীতের ভোর তো? তখন খুব অন্ধকার থাকে। নিন, এবার শুয়ে পড়া যাক!"

লোকটি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। আমি কিছুক্ষণ জেগে থাকার পর কখন যে ঘুমিয়ে গেছি তা আর কোনও হুশ নেই।

হঠাৎ ট্রেনটার একটা ঝাকুনিতে ঘুমটা ভেঙে গেল। দেখি আমার সামনে একজন টিকিট চেকার বসে বসে আপনমনে কি সব হিসাব করছেন। আমাকে নড়তে দেখেই উনি বললেন, "আপনার টিকিট দেখি?"

আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মুড়ি স্টেশন কি ছেড়ে গেছে?"

উনি উত্তরে বললেন, "না এইবার আসছে। তবে এখনো আধ ঘণ্টা দেরি আছে।"

—"তাহলে?....."

—"কি ব্যাপার বলুন তো? তাহলে কি বলবেন তো আপনি?"

—"না মানে আমার সামনে একজন লোক শুয়ে ছিলেন। উনি মুড়ি স্টেশনে নামবেন বলেছিলেন। তাই ভাবছি উনি আবার কোথায় নামলেন?"

—"কই আমি এখানে এসে বসে তো আর কাউকেই দেখছি না। স্বপ্নটপ্ন দেখেননি তো? নিন, আপনার টিকিটটা দেখান।"

তারপর আমি আস্তে কম্বল সরিয়ে মানিব্যাগের মধ্যে রাখা টিফিটটা বের করে দেখালাম। উনি আমার টিফিটটা একবার হাতেও নিলেন না। শুধু চোখ তুলে দেখলেন আর নিজের হাতের একগোছা কাগজের দিকে চোখ ফেরালেন। শুধু তাই নয়, আস্তে আস্তে উঠে চলেও গেলেন।

আমি তখন উঠে বাথরুমে গেলাম। হাতমুখ ধুয়ে বেরিয়ে এসে অবাক হয়ে গেলাম। দেখি এই কম্পার্টমেন্টের সমস্ত জানালা-দরজা হাট করে খোলা আর হু হু করে বাতাস ঢুকছে। আমি তখন কম্পার্টমেন্টের এমাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত গেলাম। একজন যাত্রীও আমার নজরে পড়ল না। এমন কি টিকিট চেকারবাবুকেও দেখতে পেলাম না। মনে হল, এত জোরে ট্রেন ছুটছে, কিন্তু লোকজনসব কোথায় গেল। চেকারবাবুও বা হাওয়া হয়ে গেলেন কি করে?

ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। তখন আর আমি হাঁটতে পারছি না। পায়ে পা জড়িয়ে যাচ্ছে। কোনরকমে নিজের বার্থে এসে ধপাস করে উল্টে পড়লাম। তারপর আর আমার কোনও হুশ নেই। বাকি রাতটুকু বেহুশ হয়েই কেটে গেল।

ট্রেনটা যখন রাঁচী স্টেশনে এসে পৌঁছাল আমি তখন সোজা স্টেশন মাস্টারের ঘরে গিয়ে ওনাকে সমস্ত ঘটনাটা বললাম। উনি তো শুনেই অবাক। বললেন, "আপনি যে কম্পার্টমেন্টের কথা বলেছেন, সেটা আমার চার্টে তো কিছু দেখছি না। তাছাড়া আজকের গাড়ির সব কম্পার্টমেন্ট তো ভর্তি এসেছে। কোনওটা তো খালি আসেনি। আপনি ঠিকঠাক বলছেন তো?"

আমি বললাম, "আপনার বিশ্বাস না হয় চলুন আমার সঙ্গে! আমি যে কম্পার্টমেন্টে এসেছি সেখানে নিয়ে গিয়ে আপনাকে সব দেখাচ্ছি। আর তাছাড়া ওই কম্পার্টমেন্টটাতো ট্রেনের একেবারে শেষে লাগানো আছে। আমার দেখাতে অসুবিধা হবে না।"

আমার কথাশুনে স্টেশনমাস্টার বললেন, "বেশ তাহলে চলুন। একবার দেখা যাক। আমি বরং রেলওয়ের রিজার্ভেসন চার্টটাও সঙ্গে নিয়ে নিই। ভালো করে মিলিয়ে দেখা যাবে। কি বলুন?"

আমি ওনাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে দেখি সত্যি সত্যিই ট্রেনটার একদম পিছনে কোনও আলাদা কম্পার্টমেন্ট নেই। সবশেষে তো গার্ড সাহেবের কম্পার্টমেন্ট। তখন স্টেশন মাস্টার বললেন, "আপনার নিশ্চয় কোথাও ভুল হচ্ছে। একটু ঠিকঠাক ভেবে দেখুন। আসলে রাঁচীতে এলেই সুস্থ মানুষের বুদ্ধিরও একটু আধটু হেরফের হয়ে যায় কিনা?"

তখন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। স্টেশনমাস্টারের মুখে ওই কথা শোনার পর আমি আর এক মুহূর্তও ওখানে দাড়ালাম না। হন হন করে স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে ভাবলাম তবে ট্রেনের ওই কম্পার্টমেন্টের লোকজন টিকিট চেকার, কম্পার্টমেন্ট সবই আমার দেখার ভুল! আর ওই কুলিটা....?

ছবি: ওয়াসিম হেলাল

তিনটে ছাগল আর ট্রল ভূত

(স্কান্ডিনেভিয়ার রূপকথা)

প্রদীপ কুমার রায়

এক সময়ে, স্ক্যান্ডিনেভিয়ার এক গ্রামে বাস করতো তিনটে ছাগল। তারা ছিল তিন ভাই আর তাদের উপাধি ছিল গ্রাফ। মোটা হওয়ার জন্য, তারা পাহাড়ের ওপরে চরতে যাচ্ছিল। সেখানে অনেক ঘাস জন্মায় তো!

পথে, একটা ঝর্ণার ওপর একটা সাঁকো ছিল। সাঁকোর তলায় থাকতো একটা ট্রলভূত। আমাদের দেশে যেমন গেছো ভূত, মেছো ভূত হয়, সেদেশে হয় তেমনি ট্রলভূত! তাঁর চোখ দুটো ছিল ভাঁটার মতন। নাকটা ছিল ঠিক,—না ঝাঁটার মতন নয়, তবে ঝাঁটার গোড়াটার মতন।

প্রথমে তো ছোট গ্রাফ ভাই, খুট-খাট খুট-খাট করে হেঁটে হেঁটে, সাঁকোর উপর দিয়ে যায়। ট্রলভূত অমনি সাঁকোর তলা থেকে মাথা তুলে বসল, খুট-খাট খুট-খাট সাঁকোর ওপর দিয়ে কে যায় রে?

ছোট গ্রাফ অমনি জবাব দিল, আমি গো! গ্রাফেদের ছোট ভাই। পাহাড়ে যাচ্ছি ঘাস খেয়ে মোটা হতে!

ট্রল ভূত বলল, তোর আর পাহাড়ে গিয়েও কাজ নেই, মোটা হয়েও কাজ নেই। আয়, আমিই তোকে খেয়ে ফেলি!

ছোট গ্রাফ ভাই বলল, দেখ, আমি তো নেহাৎই ছোট। আমার গায়ে আর কতটুকু মাংস আছে? দাঁড়াও, পেছনে আমার মেজো ভাই আসছে, সে আমার চেয়ে অনেক বড়ো, গায়ে সাহসও বেশি। তুমি বরং তাকেই খেয়ো।

ট্রলভূত বলল, ঠিক আছে, যাঃ, পালা!

ছোট ভাই অমনি খুটখাট খুট-খাট সাঁকো পেরিয়ে পাহাড়ে চলে গেল।

খানিক বাদে, ধূপ-ধাপ ধূপ-ধাপ। সাঁকোর ওপর হাজির হল মেজো ভাই। ট্রল ভূত অমনি তলা থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, ধুপ-ধাপ ধুপ-ধাপ সাঁকোর ওপর দিয়ে কে যায় রে!

মেজো গ্রাফ বলল, আমি গো! গ্রাফেদের মেজো ভাই। সাঁকো পেরিয়ে পাহাড়ে যাচ্ছি ঘাস খেয়ে মোটা হওয়ার জন্যে।

ট্রলভূত বলল, তোর আর সাঁকো পেরিয়েও কাজ নেই, মোটা হয়েও কাজ নেই। আয়, আমিই তোকে খেয়ে ফেলি!

মেজো গ্রাফ বলল, আমি তো এইটুকু! আমার গায়ে আর কত মাংস আছে? পেছনে আমার দাদা আসছে, তার গায়ে অনেক মাংস। তুমি বরং তাকেই খেয়ো! ট্রল ভূত বলল, ঠিক আছে, যাঃ পালা!

শেষকালে এসে হাজির হল বড়ো গ্রাফ ছাগল। বিশাল চেহারা! গায়ের বড়ো বড়ো লোম ঝুলে মাটি ছুঁয়েছে। সে দুম-দাম দুম-দাম করে সাঁকো পেরিয়ে যাচ্ছে। ভীষণ মোটা তো! তার ভারে সাঁকো একেবারে ভেঙে পড়ে আর কি!

ট্রল ভূত অমনি মুখ বাড়িয়ে বলল, দুম-দাম দুম-দাম সাঁকো পেরিয়ে কে যায় রে?

—আমি। বড়ো গ্রাফ ছাগল। পাহাড়ে যাচ্ছি, ঘাস খেয়ে মোটা হয়ে ফিরবো।

ট্রল ভূত বলল, তোর আর পাহাড়ে গিয়েই কাজ নেই, মোটা হয়ে কাজ নেই। এগিয়ে আয়, আমিই তোকে খেয়ে ফেলি।

বড়ো গ্রাফ ছাগল শুধু বলল, ঠিক আছে, চলে আয়।

বড়ো গ্রাফ তো শিং উঁচিয়ে, মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। যেই না ট্রল ভূত এগিয়ে এসেছে, অমনি সে করেছে কি, ট্রল ভূতটাকে একেবারে শিঙে তুলে নিয়েছে। তারপর কয়েক পাক ঘুরিয়ে তাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়েছে। আকাশে খানিকক্ষণ ঘুরপাক খেয়ে, ট্রল ভূত যখন নীচে এসে দড়াম করে এসে পড়ল, তখন সে একেবারে খতম্। এর মধ্যেই বড়ো ছাগল দুম্‌দাম্ দুম্‌দাম সাঁকো পেরিয়ে পাহাড়ের দিকে রওনা দিয়েছে।

এখন নাকি তিন গ্রাফভাই পাহাড়ের ঘাস খেয়ে এমন মোটা হয়েছে যে, তাদের চিনতেই পারা যায় না। খুব ইচ্ছে থাকলেও, তাদের আর পুল পেরিয়ে গ্রামে ফিরে আসার উপায় নেই। ওদের যে-কোনো ভাই সাঁকোয় চড়লেই সাঁকো একেবারে হুড়মুড় করে নীচে ভেঙে পড়বে যে!

ছবি: অভীক কুমার মৈত্র

এটা কিন্তু মোটেও গল্প নয়। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, তা সে প্রায় আজ থেকে দু-কুড়ি বছর আগেকার কথা। তখন এখনকার মতো গ্রামে গ্রামে ইলেকট্রিক আলো জ্বলেনি আর ঘরে ঘরে সন্ধ্যে হলেই টিভি খুলে সিরিয়াল দেখার রেওয়াজ চালু হয়নি। সেকালে পাড়াগাঁয়ের মানুষ সন্ধ্যে বেলা লণ্ঠন কিংবা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে কিংবা কোনো মাতব্বর লোকের বাড়ির বৈঠকখানায় বসে গল্প গাছা করত আর তামাক খেত। মাঝে মধ্যেই পালপার্বনে বসত যাত্রা কিংবা হরিনাম সংকীর্ত্তনের আসর। সারা রাত জেগে লোক যাত্রা দেখত তারপর সকালে উঠে যে যার কাজে চলে যেত। এই যাত্রায় অভিনেতা অভিনেত্রীরাও যেমন কোন টাকা পয়সা নিত না তেমনি দর্শকদেরও কোন টিকিট কাটতে হোত না। তবে কেউ খুব খুশি হলে শিল্পীদের দশ-বিশ টাকা পুরস্কার দিত। সেফ্‌টিপিন দিয়ে সেই টাকা তাদের পোশাকের সঙ্গে আটকে বুকের ওপর ঝুলিয়ে দেওয়া হত। তখনকার দিনের অবশ্য সেই দশ, বিশ টাকারও দাম ছিল। তা প্রায় এখনকার একশ, দুশো টাকার মতো হবেই।

আমি যে সময়টার কথা বলছি তখন ছিল ভাদ্রমাস। ইংরেজী আগস্টের শেষ অথবা সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে। পাশের গ্রামের যাত্রার দল 'দয়াময়ী অপেরা' সেবার মনসাপুজো বা অরন্ধন উপলক্ষ্যে আমাদের গ্রামে যাত্রা করার জন্য আমন্ত্রিত হলো। পালার নাম মনসার ভাসান। সন্ধ্যে হতে না হতেই আমাদের গ্রাম তো বটেই, আশপাশের আরও দু-তিনখানা গ্রামের মানুষ রাতের খাবার সেরে যে যার মতো একটি করে কেরোসিন লণ্ঠন হাতে নিয়ে রওনা দিল যাত্রার আসরের উদ্দেশ্যে। দেখতে দেখতে আসরে আর তিল ধারণার স্থান রইল না। যেদিকে তাকানো যায় শুধু কালো কালো মানুষের মাথা, মাঝখানে

হ্যাজাক লাইটের আলোয় সামিয়ানা খাঁটানো। চারদিক খোলা মঞ্চ যেন এক আশ্চর্য রহস্য বলি বলি করে চেপে রেখেছে আর মিটি মিটি হেসে যাচ্ছে। আমাদের মতো কচিকাঁচারা একেবারে সামনের সারিতে বসে হাঁ করে তাকিয়ে দেখছি আর কেবলি বুকের মধ্যে টিপ্ টিপ্ করে গুরগুরিয়ে উঠছে উত্তেজনা আর আনন্দের ঢেউ, কি কি হয়।

এদিকে মঞ্চ থেকে একটু দূরে চট ঘিরে যে ছোট গ্রীন রুমটা তৈরি হয়েছিল, সেখানে তখন এক ভীষণ উদ্বেগের আবহাওয়া তৈরি হয়েছে। সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত প্রায় একপ্রহর হতে চলল, দর্শকদের দিক থেকে ক্ষণে ক্ষণে ভেসে আসছে চিৎকার—শুরু হোক, শুরু হোক—এমনকি মঞ্চে কনসার্ট পর্যন্ত শুরু হয়ে গেছে অধিকারীর নির্দেশে, অথচ মুখ্য চরিত্র চাঁদ সদাগর যিনি সাজবেন—তাঁর তখনও পর্যন্ত দেখা নেই। পাশের গ্রাম জগৎবেড়িয়ায় বাড়ি তাঁর। হাঁটাপথে মোটে আধঘন্টার দূরত্ব। সেদিন তাঁর ছেলেটির খুব জ্বর। তাই তিনি বলেছিলেন ডাক্তার বাবুকে ডেকে এনে ছেলেকে দেখাতে হবে। সে একটু সুস্থ হলেই তিনি আসরে আসবেন। ঠিক সময়ের আগেই এসে পৌঁছবেন যেমন করেই হোক।

এর আগেও বহুবার এমন হয়েছে। দল চলে এসেছে দুপুর দুপুর। তারপর মঞ্চ তৈরি, গ্রীনরুম বসানো, মেকআপ ইত্যাদি সারতে সারতে অভিনেতারা সবাই এসে পৌঁছে গেছেন। তাই ক্ষুদিরাম সামন্তের কথায় অধিকারীও কোন আপত্তি করেননি।

কিন্তু এখন তো তাঁর মাথায় হাত। একে তো সামন্ত মশায়েরই প্রধান চরিত্র অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি পার্ট, তার ওপর যে ছেলেটাকে একস্ট্রা হিসাবে রাখা হয়েছিল সেও সেদিন আমাশায় একেবারে শয্যাশায়ী। সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল নিয়ে লোক পাঠানো হল জগৎবেড়িয়ার ক্ষুদিরাম সামন্তের বাড়ি। সে লোক পনেরো কুড়ি মিনিটের মধ্যে ঘুরে এসে হাপরের মত হাঁপাতে লাগল। অধিকারী মশাই বল্লেন—

—কিরে, চাঁদু কি খবর বাপ

—আর হবেনি কাকা, তুমি পালা বন্ধ করে দাও

—কেনে বাপ্—তবে কি সামন্তর ছেলেটা...

—না না, সে ছেলে ভালো আছে। সামন্ত খুড়ো ডাক্তার দেইকে বের হয়ে গেছে সনজের আগে।

—তবে সে লোক গেল কনে?

—কে জানে? গাঁজা খোর লোক কোথায় গে গাঁজায় দম মারতেছে দেখ।

—এখন কি হবে বাপ? এতো লোক, আশা করে সব এয়েচে, দুর দুরস্ত থিক্যা, মান ইজ্জত আর রইলুনি রে।

—মাথায় হাত দিয়ে থপ্ করে সে পড়লেন অধিকারী মশাই গ্রীনরুমের কাঁচা মাটির ওপর।

আসরের মধ্যে তখন উত্তেজিত জনতা ছোট ছোট ঢিল ছুঁড়তে আরম্ভ করে দিয়েছে।

—এমন সময় হঠাৎ যেন অন্ধকার ফুঁড়ে হঠাৎ একটা মানুষ উঠে এলো। সারা শরীর কালো চাদরে ঢাকা, সে এসেই বলে উঠল—

—একি, এখনো শুরু করনি পালা!

অধিকারী মশাই মাথাটা তুলে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। লোকটা তখন গা থেকে কালো চাদরটা ফেলে দিয়ে একগাল হেসে বলল—

—এট্টু দেরী হয়ে গেল, কিছু মনে করনি দাদা।

—অধিকারী দেখল তার সামনে দাঁড়িয়ে, চাঁদসদাগর রূপী স্বয়ং ক্ষুদিরাম সামন্ত, অপরাধী মুখে হাত কচলাচ্ছে। অধিকারী মশাই হাসবেন না কাঁদবেন না চটে উঠে চিৎকার চ্যাঁচামেচি করবেন কিছুই ঠিক করে উঠতে না পেরে তিনি শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। এমনকি জিজ্ঞেস করতেও ভুলে গেলেন যে কি করে, কোথা থেকে চাঁদসদাগরের ঝলমলে জরির পোশাকখানা পরেই একেবারে ফুল মেকআপ নিয়ে হাজির হয়ে গেল সামন্তের পো। শুধু তাই নয়, হেঁতালের লাঠিখানা মাথার ওপর ঘুরিয়ে হুংকার ছাড়ল—'যে হাতে পূজেছি আমি দেব শূলপানি, সেই হাতে না পূজিব চ্যাং মুড়ি কানি'।

যাইহোক, পালাতো শুরু হয়ে গেল, কনসার্ট কিছুক্ষণ পুরোদমে বাজার পর থেমে গেছে। এখন কেবল হারমোনিয়ম ও বেহালার সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে গান গেয়ে চলেছেন চাঁদসদাগর পত্নী সনকা। দুঃখিনী সনকা। স্বামী তাঁর সপ্তডিঙা মধুকর নিয়ে বাণিজ্য করতে বের হলেন। তারপর একে একে চলে গেল বারোটি বছর। স্বামীর দেখা নেই, দুঃখের আকুল আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ছে, গানের সুরে সুরে সান্ত্বনা দেন সখীরূপিনী স্বয়ংদেবী মনসা—

"কাইন্দো নাগো সখী আর কাইন্দো না
ফিরিবে ফিরিবে চাঁদ পুরাবে মনের সাধ
দূরে যাবে বিরহ যাতনা"

এমনি সময়ে চাঁদ সদাগরের প্রবেশ। ছিন্ন কন্থা পরণে, চুলদাড়িতে ঢাকা মুখ। এ কেমন সদাগর। এতো তাঁর স্বামী নয়। ভয়ে আঁতকে ওঠে সনকা। কিন্তু চাঁদ যখন বর্ণনা করেন তাঁর দুঃখের কাহিনী, কেমন করে নৌবহর সমুদ্রে ডুবে যাবার পর ভাসতে ভাসতে কূলে এসে এই বারোটি বছর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে কোনক্রমে প্রাণটুকু

বাঁচিয়ে রেখেছেন তখন সে করুণ কাহিনী শুনে স্বামীর বুকে আছড়ে পড়েন সনকা।

কিন্তু এ কি! হঠাৎ সনকার দু-চোখ যেন ভয়ে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে যায়। দৃশ্য কোনমতে শেষ করে গ্রীনরুমে ফিরে সনকা বেশিনী তরুণী ডাক পাড়েন অধিকারীকে—সামন্ত দার কি হয়েছে গো অধিকারী জ্যাঠা—

কেনে—কি হবে? সোন্দর পাঠ বলছে, তুই চোখ দুটো আমড়া আঁটি করেছেলি কেনে?

—তুমি বললে পেত্যয় যাবেনি জ্যাঠা এক্কেবারে বরফের পারা ঠান্ডা।

—হ্যাঁ! তোর মুন্ডু! সামন্ত কোথা গেলি ও সামন্ত। কিন্তু গ্রীনরুমে সামন্তর আর দেখা পাওয়া গেল না। অধিকারী ভাবল বোধহয় বিড়ি-টিড়ি খেতে গেছে বাইরে। কিংবা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে। যাইহোক পালাতো এগিয়ে চলেছে দৃশ্যের পর দৃশ্যে। রাত ও আর বড় বেশি বাকি নেই। পূব আকাশের গায়ে তামার মতন হাল্কা রঙ ধরতে শুরু করেছে। আমরা ছোটরাতো ঘুমিয়েই পড়েছি। বড়রাও হাই তুলছে। লন্ঠন নিভিয়ে কেউ কেউ বাড়ি যাবার উদ্যোগ করছে।

এমন সময় হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা ভীষণ সোরগোল উঠল। মুহূর্তের মধ্যে ভিড় দু-দিকে সরে দাঁড়িয়ে একটা রাস্তা তৈরি করে দিল। জনতার চোখে মুখে ভয় বিস্ময়। যেন কী ভীষণ এক বিভীষিকা দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে তারা। ততক্ষণে যাত্রাও থেমে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল তিনচারজন লোক ধরাধরি করে একটা মৃত লোককে এনে আসরের মধ্যেখানে শুইয়ে দিল। সমস্ত শরীরখানা তার নীল হয়ে গেছে। লোকটা আর কেউ নয়—স্বয়ং ক্ষুদিরাম সামন্ত, আমাদের চাঁদ সদাগর।

ভোরবেলা জনাচারেক চাষী-বাসী মানুষ মাঠে যাচ্ছিল। হঠাৎ গাঁয়ের সীমানার কাছে তেখালির জোড়াবটতলায় আলের পাশে সামন্তমশায়ের নিথর দেহটা তারা পড়ে থাকতে দেখে। বিষে সারা শরীর নীল হয়ে গেছে।

সম্ভবতঃ তাড়াতাড়ি যাত্রার আসরে পৌঁছতে হবে বলে সামন্তমশাই রাস্তা ছেড়ে মাঠের পথ ধরেছিলেন। কোণাকুণি আলপথে ধরেই হাঁটছিলেন হন্‌হন্‌ করে। ভাদ্রমাস কালকূট বিষ নিয়ে পথের মধ্যেই ছিল কোন নাগিনী। জাতশত্রু চাঁদসদাগরকে পথের মধ্যেই সে বসিয়ে দিয়েছিল মৃত্যু ছোবল।

কিন্তু তাতেও চাঁদসদাগরকে শেষ পর্যন্ত সে আটকাতে পারেনি। যাত্রা পাগল চাঁদসদাগর ঠিক সময়ে সঠিকভাবে নিজের পার্টটুকু বলে পালা সাঙ্গ করে গিয়েছেন।

ছবি: অভীক কুমার মৈত্র

ব্যাপারটা যখন ভৌতিক

সুভদ্রকুমার সেন

বাংলা সাহিত্যে ভূতের গল্পের ঐতিহ্য অনেকদিনের। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র একটি ভূতের গল্প লেখা শুরু করেন, যদিও সেটি অসমাপ্ত থেকে গিয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ও সুন্দর ভূতের গল্প রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথে'। 'ক্ষুধিতপাষাণ' বা 'মণিহারা'-তেও খানিকটা ভৌতিক ছোঁওয়া আছে। বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব মহারথিরাই ভূতের গল্প লিখেছেন। ব্যতিক্রম শরৎচন্দ্র (যদি তাঁর 'শ্রীকান্ত'-র শ্মশানের গা ছম্‌ছমে অংশটা আলাদাভাবে না ধরি), সুবোধ ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। কেন প্রায় সব বিশিষ্ট সাহিত্যিকই কম বেশি ভূতের গল্প লিখেছেন বাংলাদেশে এ বিষয়ে আমার একটা তত্ত্ব আছে। সেটা আমি বোঝাবার চেষ্টা করছি।

প্রথমতঃ যদিও যে কোনো মানুষের জীবনেই মৃত্যু অনিবার্য পরিণতি তাহলেও মৃত্যুর পরের জগৎটার অনিশ্চয়তা সৃষ্টিশীল মানুষকে সর্বদা আকর্ষণ করে। যদিও আত্মার অবিনশ্বর অস্তিত্ব অনেকেই বিশ্বাস করেন।

দ্বিতীয়তঃ জমজমাট ভূতুড়ে পরিবেশ সৃষ্টি করাতে রীতিমত মুন্সীয়ানা লাগে। যে কোন কুশলী সাহিত্যিকের কাছে এটা একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ। এমন বেশ কয়েকটি বাংলা গল্প আছে যার পরিবেশটি রীতিমত ভূতুড়ে কিন্তু পরিসমাপ্তিটি অন্যরকম। যেমন প্রভাতকুমার মুখুজ্জ্যের 'রসময়ীর রসিকতা' অথবা প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পান্থনিবাস' অথবা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছবির ভূত'।

তৃতীয়তঃ বাংলা সাহিত্যের ভূতের গল্পের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী রবীন্দ্রনাথ। যেহেতু তিনি একাধিক রসোত্তীর্ণ ভূতের গল্প লিখেছেন তাই অনুজ বাংলা সাহিত্যিকেরা সম্ভবতঃ অনুপ্রাণিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রের মত এক্ষেত্রেও ভগীরথের ভূমিকা নিয়েছিলেন। যার ফলে বাংলা ভূতের গল্পের ধারাটি যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়েছে। বাংলা গদ্য সাহিত্যে ভূতের গল্পের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমৃদ্ধ থাকলেও বাংলা কবিতায় অলৌকিক বা অতিলৌকিকের সার্থক প্রয়োগ খুবই কম। ইংরেজিতে স্যামুয়েল কোলরিজের 'ক্রিস্টাবেল', আংশিকভাবে 'রাইম অফ দি এনশিয়েন্ট মেরিনার' অথবা ওয়াল্টার ডে-লা-মেয়ারের 'লিস্টনার্স' খুবই উল্লেখযোগ্য। বাংলায় এরকম ব্যতিক্রমী প্রয়াস একটিই চোখে পড়েছে। সেটি হল অন্নদাশংকর রায়ের কাব্যনাট্য 'রাতের অতিথি'। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'একপয়সায় একটি' সিরিজে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল।

বাংলা ভৌতিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে দুজন সাহিত্যিক আমার বিশেষ প্রিয়। একজন হেমেন্দ্রকুমার রায়, দ্বিতীয়জন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও হেমেন্দ্রবাবু মূলতঃ ছোটোদের জন্য গল্প লিখেছেন, শরদিন্দুবাবুর অধিকাংশ গল্পই মূলতঃ বড়দের। শরদিন্দু বাবুর 'কালো মোরগ'-কে আমার একটি সর্বাঙ্গসুন্দর ভূতের গল্প বলে মনে হয়। এছাড়াও ওঁর 'মধুমালতী' ও 'দেখা হবে' গল্প দুটিও চমৎকার। প্রমথনাথ বিশী ও বনফুল বড়দের জন্য জমজমাট ভূতের গল্প লিখেছেন। ভূতের গল্পে ব্যঙ্গকে চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন পরশুরাম

ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁদের 'মহেশের মহাযাত্রা' ও 'কঙ্কালের টঙ্কার' গল্পদুটি রসোত্তীর্ণ হয়েছে। গল্পদুটিতে কবিতার ব্যবহারও একটা অন্যমাত্রা এনে দিয়েছে। আধুনিক যুগে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় কয়েকটি চমৎকার ভূতের গল্প লিখেছেন। 'মনোজদের' অদ্ভুত বাড়ি' উপন্যাসটিতে অদ্ভুতুড়ে মজার পরিবেশ সৃষ্টিতে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। শিবরামও নিজস্ব স্টাইলে একাধিক ভূতের গল্প লিখেছেন।

এখন বড়দের জন্য ভূতের গল্প অনেক কম লেখা হচ্ছে। কোলকাতা শহরে ক্রমবর্দ্ধমান শব্দের বাহুল্য ও আলোর ঝলমলানি ভূতেদেরকে প্রায় ভাগিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া রয়েছে সাম্প্রতিক কয়েক দশকের হর্ন বিস্ফোরণ যার ফলে নির্জনতা বস্তুটি গায়েব হয়ে গেছে। কর্মব্যস্ত মানুষের অবকাশও এখন প্রায় নেই। ষাটের দশকের প্রথম দিকে যেমন ভূতের গল্পের জমাটি আসর বসত অতুল গুপ্ত মশাইয়ের বাড়িতে। এতে অনেক মহারথীরাও উপস্থিত হতেন। জানা যায় সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও ধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখুজ্জে ও এখানে ভূতের গল্প বলেছেন। আশির দশকের প্রথম দিকে আমাদের বাড়িতেও এরকম আড্ডা বসত—তাতে উপস্থিত থাকতেন সমরেশ বসু, সন্তোষকুমার ঘোষ, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, দিলীপকুমার বিশ্বাস, সুমথনাথ ঘোষ প্রমুখ। সমরেশবাবু ও সুমথবাবু একাধিক জমাটি ভূতের গল্প বলেছেন।

একান্তভাবে আমার প্রিয় কয়েকটি ছোটেদের ভূতের গল্প :

- ☐ কঙ্কাল সারথি
- ☐ কঙ্কালের টঙ্কার
- ☐ মেট্রোয় বুড়ি (বুদ্ধদেব বসু)
- ☐ বন্ধু (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)
- ☐ ভুতুড়ে খাদ (শৈলজানন্দ), কোলকাতার গলিতে (প্রেমেন্দ্র মিত্র)
- ☐ লক্ষ্মী (বিভূতিভূষণ)
- ☐ রতনবাবু ও সেই লোকটা
- ☐ মহেশের মহাযাত্রা
- ☐ গন্ধটা খুব সন্দেহজনক (শীর্ষেন্দু)।

কয়েকটি অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত অথচ ভালোমানের গল্প—

- ☐ 'বাড়িটা' (অলকচন্দ্র গুপ্ত)
- ☐ X-C হও (সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল)
- ☐ রাজাবাহাদুরের রঙ্গমঞ্চ (ফণীন্দ্রনাথ পাল)।

বাংলার ভূতের গল্পের ভাণ্ডার যথেষ্ট সমৃদ্ধ, কিন্তু একটা আক্ষেপ, Walter de-la mare-এর 'Return'-এর মতো ভালো কোনো উপন্যাস লেখা হয়নি, যেখানে অজান্তে একটি পোড়ো কবরের ওপরে ঘুমিয়ে একটি মানুষের জীবন আমূল বদলে যায়।

অনুলিখন: সুগত রায়

ভূতের রাজ্যে গোয়েন্দাগিরি

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

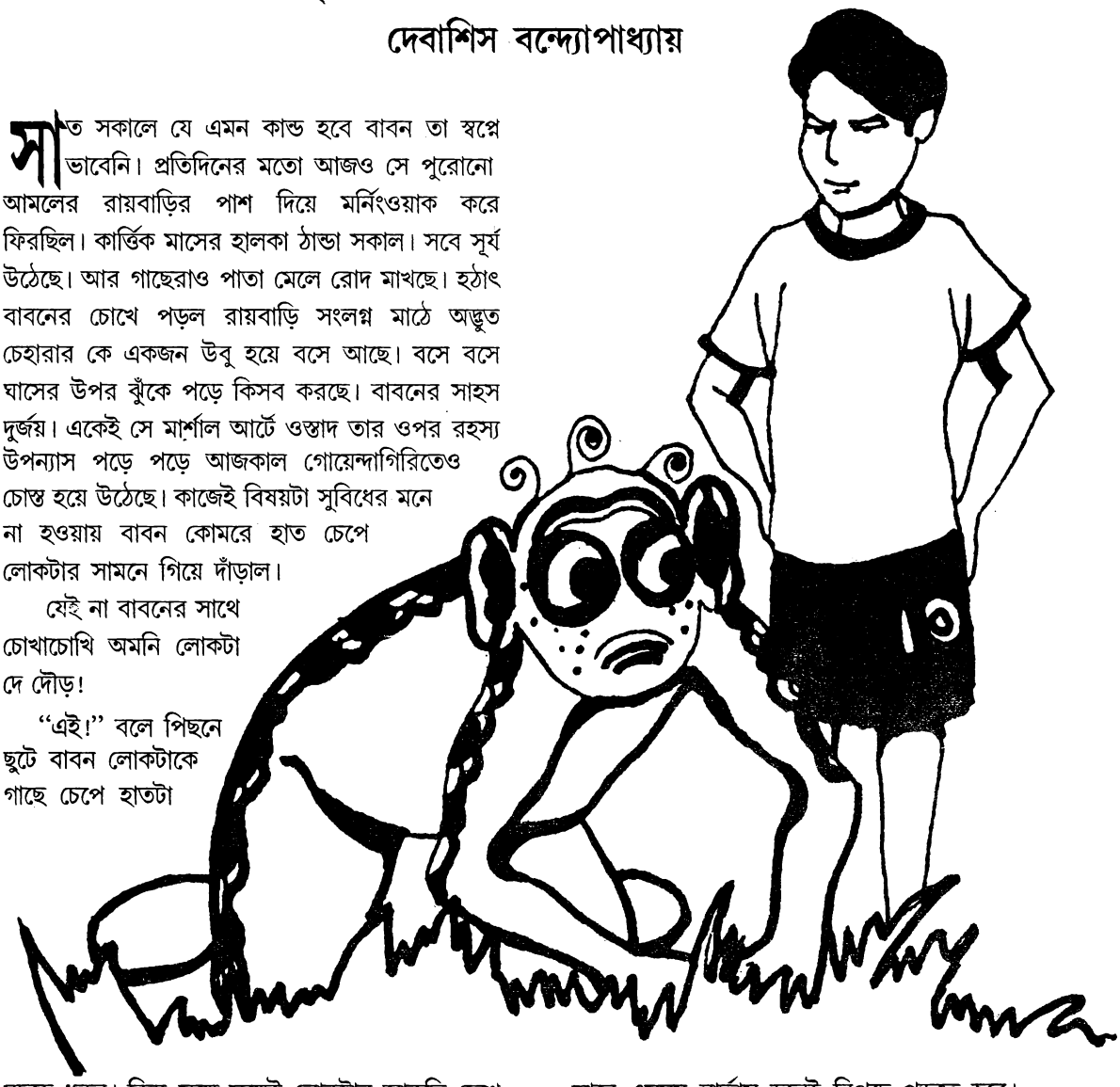

সাত সকালে যে এমন কান্ড হবে বাবন তা স্বপ্নে ভাবেনি। প্রতিদিনের মতো আজও সে পুরোনো আমলের রায়বাড়ির পাশ দিয়ে মর্নিংওয়াক করে ফিরছিল। কার্ত্তিক মাসের হালকা ঠান্ডা সকাল। সবে সূর্য উঠেছে। আর গাছেরাও পাতা মেলে রোদ মাখছে। হঠাৎ বাবনের চোখে পড়ল রায়বাড়ি সংলগ্ন মাঠে অদ্ভুত চেহারার কে একজন উবু হয়ে বসে আছে। বসে বসে ঘাসের উপর ঝুঁকে পড়ে কিসব করছে। বাবনের সাহস দুর্জয়। একেই সে মার্শাল আর্টে ওস্তাদ তার ওপর রহস্য উপন্যাস পড়ে পড়ে আজকাল গোয়েন্দাগিরিতেও চোস্ত হয়ে উঠেছে। কাজেই বিষয়টা সুবিধের মনে না হওয়ায় বাবন কোমরে হাত চেপে লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

যেই না বাবনের সাথে চোখাচোখি অমনি লোকটা দে দৌড়!

"এই!" বলে পিছনে ছুটে বাবন লোকটাকে গাছে চেপে হাতটা মুচড়ে ধরল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই লোকটার আকৃতি দেখে বাবন ঘাবড়ে গেল। লোকটার হাতটা বরফের মতো ঠান্ডা। পায়ের গোড়ালি আগে পাতা পিছনে। চোখগুলো গোল ও ঘোলাটে। তবে লোকটার চোখমুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে সে ভয় পেয়েছে। তাই বাবন তাকে একটু ধমকের স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "এই কে তুমি?"

লোকটা কাঁপা গলায় জবাব দিল, "আজ্ঞে আমি কালাচাঁদ মামদো। আমায় ছেড়ে দাও। আমি অদৃশ্য হবার মন্ত্রটা মনে করার চেষ্টা করি।"

বাবনের মাথায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। এক ঝলকে বুঝতে পারল সে একটা জলজ্যান্ত ভূত ধরেছে। তাই সে কিছুটা ধাঁধায় পড়ে মামদোটার হাতটা ছেড়ে দিল। বাবন জানে এসময় নার্ভাস হলেই বিপদে পড়তে হবে।

তাই সে দৃপ্ত চোখে সামনে তাকাল। মামদোটা কাচুমাচু মুখ করে দাঁড়িয়েছিল। বারকয়েক মাথা চুলকে আপনমনে ঘাড় নেড়ে বলল, "না, কিছুতেই মনে পড়ছে না।" তারপর বাবনকে উদ্দেশ্য করে কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করল, "অদৃশ্য হবার মন্ত্রটা তুমি কি জানো?"

বাবন মনের মধ্যে থেকে অসম্ভবের চিন্তাগুলো তাড়িয়ে সোজাসাপটা জানাল, "আমি কোথা থেকে জানব? আমি কী কোনও দিন অদৃশ্য হয়েছি! তা পড়ার সময় ওরকম ফাঁকি দাও কেন, যে কাজের সময় মনে থাকে না! মন দিয়ে না পড়লে কখনও ভূতের মতো ভূত হতে পারবে না।"

"সে তো মামদোপল্লীর সবাই বলে, 'কালাচাঁদ একটা গোভূত।' কিন্তু অদৃশ্য হতে না পারলে এখন আমার কী হবে!" বলে কালাচাঁদ কাঁদোকাঁদো হয়ে গেল।

বাবন তাকে সান্ত্বনা দিতে বলল, "মনোনিবেশ করার চেষ্টা করো। ঠিক মনে পড়বে। তা তুমি ঘাসের ওপর ঝুঁকে কী করছিলে?"

"শিশিতে শিশির সংগ্রহ করছিলাম।"

"কেন?"

"আজ যে আমার বিচার হবে। যাতে শাস্তিটা কমের ওপর হয় তাই রাজাকে একশিশি 'তৃশির' ঘুস দেবার ব্যবস্থা করছিলাম আরকি।"

"তৃশির?"

"হ্যাঁ। 'তৃশির' হল তৃণের রস আর শিশিরের মিশ্রণ। ওটা টাকের ওষুধ। রাজা মশাইয়ের মাথা ভর্তি টাক। এর জন্য ওনার শোকের শেষ নেই। সামনে কেউ টুঁ শব্দ না করলেও ভূতসমাজে আড়ালে আবডালে যে ওনাকে 'টেকোরাজ', 'টাকেশ্বর' ইত্যাদি বলা হয় সেটা ওনার কানে গেছে। চুল গজানোর আশায় কত কী যে করলেন। গাদাগাদা বিচুটিপাতা ঘসলেন টাকে। সেই তিন ক্রোশ দূরের ডাকিনী মার্কেট থেকে কতরকম ব্র্যান্ডের 'তৃশির' আনালেন। কিছুতেই কিছু হল না। সব ভেজাল। পুকুরের জল মেশানো। তাইতো নিজের হাতে এই টাটকা 'তৃশির' বানাচ্ছি। যে প্রেতিনিটা বিচারের সময় মহারাজকে বাতাস করবে, তাকে নিমফলের আচার খাইয়ে রাজি করিয়েছি। তাল বুঝে মহারাজের টাকে একটু মাখিয়ে দিয়ে জোরে জোরে বাতাস করে দেবে। এতে মাথাও ঠান্ডা হবে আর টাটকা 'তৃশির'-এর গন্ধে মহারাজের মনটা খুশি হয়ে গেলে হালকা কোনো শাস্তি বিধান হবে আমার।"

"তিনি কী বুঝবেন যে তোমারটা আসল?"

"আসল 'তৃশির'-এর সুবাসই আলাদা। শিশির এর সঙ্গে পরিমাণ মতো কচি ঘাসের রস মিশিয়ে ওষুধ বানাবে এমন ধৈর্য আছে কারো। সব গাছে বসে থাকবে, হাসাহাসি করবে, আর পা দোলাবে।"

"বুঝলাম। কিন্তু তোমার শাস্তি হবে কেন?"

"সে অনেক কথা। শুনতে গেলে তোমার বহুত সময় নষ্ট হয়ে যাবে।"

"না। না। আজ তো রোববার। পড়তে যাওয়া নেই। তুমি বলো যদি তোমায় কোনও সাহায্য করতে পারি। তুমি ভূতটা বেশ ভাল।"

কালাচাঁদ প্রশংসা শুনে খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল। লজ্জা লজ্জা ভাব করে বলল, 'চলো তবে ওই গাছতলায় গিয়ে বসি।"

সামনের বকুলগাছটার নীচে বাবু হয়ে বসে কালাচাঁদ বলতে শুরু করল, "সে কী বলব তোমায় দুঃখের কথা। আমি মানুষটা ছিলাম একটু দুর্বল প্রকৃতির। কোনও কালে গাছে চড়া তো দূরের কথা গাছ ছুঁয়েও দেখিনি পিঁপড়ে কামড়ে দেবার ভয়ে। মরার পর এ জগতে এসে দেখলাম সব নতুন ভূতেরা গাছে ওঠার চেষ্টায় ঘন্টার পর ঘন্টা গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে বসে আছে। আমার বিষয়টা পছন্দ হল না। মনে হল এভাবে সময় নষ্ট করার মানেই হয় না। যখন আগে চড়িনি তখন এখনও চড়ব না। ফলে অন্য ভূতেরা একসময় গাছে উঠে পা দোলাতে শিখে গেল। আমি মাটির কাছাকাছিই রয়ে গেলাম। ভূতেরা গাছে চড়ে বসে আমায় উঠে আসতে বলত, যা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এইভাবে আমি একা পড়ে গেলাম। গল্প করার সঙ্গী না পেয়ে আমি তখন গাছ তলায় বসে বসে চাঁদ দেখতাম, পেঁচা দেখতাম। অন্ধকার রাতে জোনাকির ঝাঁকের কাছে গিয়ে ফু দিয়ে হাওয়ার দিক পাল্টে পাল্টে তাদের সপ্তর্ষিমন্ডল, কালপুরুষের মতো করে সাজিয়ে দিতাম। জোনাকিগুলোও সেইমতো সজ্জায় জ্বলত নিবত। কী অদ্ভুত যে লাগত কী বলব তোমায়। যেন হাতের কাছে আকাশের নক্ষত্ররা ঘোরাঘুরি করছে। এই সব নিয়ে খেলতে আমার দারুণ লাগে। কিন্তু অন্য ভূতেরা আমায় প্যাঁক দেয়। আমি গাছে চড়তে পারিনা, ওদের সঙ্গে হাসাহাসি করি না। আচ্ছা অকারণ হাসাহাসি করা কি ঠিক? ধুর! লোকে বোকা বলবে।"

"অথচ আমাদের ওটাই নিয়ম। তোমাদের যেমন পরচর্চা। যদিও ওদের আমি পাত্তা দিতাম না। আমি যা পারি তা তো ওরা পারে না। কিন্তু গতকাল দুপুরে যে আমার মাথায় কী চাপল! ভাবলাম গাছে ওঠাটা শিখেই নিই। রায়বাড়ির উঠোনের নিমগাছটার একটা নিচু ডালে অনেক চেষ্টা করে কোনওরকম উঠে পড়লাম। ডালে চড়ে বসে অদ্ভুত আনন্দ লাগল। আর আমাকে কেউ গাছে ওঠা নিয়ে কথা শোনাতে পারবে না। তাছাঁড়া ওপরে উঠে মনে হল বেশি উঁচুতে উঠতে পারলে আরো দূরের জিনিস দেখতে পাব। ভাবতে ভাবতে এত মজা লাগল যে আমি ডাল ধরে ঝাঁকাতে লাগলাম। গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়তে লাগল। এতরকমভাবে পাতা মাটিতে পড়ে জানতাম না। ভাসতে ভাসতে, ঘুরে ঘুরে, দোল খেতে খেতে। দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে ডালটা জোরে জোরে ঝাঁকাতে লাগলাম। এমন সময় কোথা থেকে রায়েদের ঝি ঝাড়ুমতি এসে সব গোলমাল করে দিল প্রথমেই— 'কে রে!' বলে ঝাঁটা উচিয়ে তেড়ে এল আমি ঘাবড়ে গিয়ে হাত ফসকে নীচে পড়লাম ধপাস

করে। একটু আহা বলা নেই। ধরে তুলে দেওয়া নেই। ওই অবস্থাতেই পিঠে ঝাঁটার ঘা বসিয়ে দিল সপাৎ করে। ব্যাস অদৃশ্য হবার মন্ত্রতন্ত্র সব ভুলে গেলাম। টেনসনে আমার সব গন্ডগোল হয়ে যায়। ঝাড়ুমতি ঝেঁঝে আমায়—'বাঁদর, উল্লুক, ভাল্লুক'—বলে গালমন্দ করল। আচ্ছা আমাকে তো সামনে থেকে দেখছ, আমাকে দেখতে কি ভাল্লুকের মতো? নিজেকে তো দেখতে পাই না। আমাদের আয়না দেখা নিষেধ আছে যে।"

"ভাল্লুকের মতো হতে যাবে কেন। তুমি তোমার মতোই। ওসব কথার কথা। তারপর কী হল বলো।"

"তারপর উঠোন নোংরা করা নিয়ে পাঁচ কথা শুনিয়ে আমাকে সারা উঠোন ঝাঁট দিয়ে পরিস্কার করা করালো। ঝুঁকে ঝুঁকে অমন প্রকান্ড উঠোন ঝাঁটানোর ফলে রাতে কোমরে যা ব্যথা করেছিল। কী বলব তোমায়!"

"কিন্তু এর সঙ্গে তোমার বিচারের কী সম্পর্ক?"

"আর বোলো না। এক শাঁখচুন্নি ছেলের বুদ্ধি খুলবে বলে রায়েদের বাগান থেকে ব্রাহ্মীশাক তুলছিল। চুপিসারে ঘটনাটা দেখে নিয়ে পাড়ায় রটিয়ে দিয়েছে। মহারাজ এসব সাতে-পাঁচে থাকেন না। কেবল চুলের দুশ্চিন্তায় মুখ ভার করে বসে থাকেন। আসল বদমাশ মন্ত্রীটা। সব সময় উল্টেপাল্টে অনুশাসন। ওই যে প্রেতিনিটার কথা বলছিলাম না? মহারাজকে বাতাস করে। ওর বড় শখ মাঠের ধারে চাঁপা গাছটায় থাকার। চাঁপা ফুলের ভুরফুরে গন্ধ, তাছাড়া চাঁদনি রাতে সেখানে এক চাষি পরিবারের বাচ্ছা ছেলে বাঁশি বাজিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ওরকম মধুর সুর নাকি ও কখনও শোনেনি। কিন্তু মন্ত্রীর কড়া হুকুম ওকে শ্যাওড়া গাছেই থাকতে হবে। কাল আমার কাছে ঘ্যানঘ্যান করে দুঃখ করছিল। নিমফলের আচার খাওয়াতেই আমার কাজটাতে রাজি হয়ে গেল। তবে মন্ত্রী যেরকম ভীষণ হিংস্র স্বভাবের। রাজাকে উপঢৌকন দিয়ে কব্দুর সামলানো যাবে কে জানে।

এইতো সেদিন আমাদের গঙ্গাধরকে পাঠালেন ঘোষ বাড়ির ছোটকর্তার ঘাড় মটকে দিয়ে আসতে। ছোটকর্তা সন্ধেরাতে পুকুরঘাটে বসে খোনা গলায় হিন্দি গান গায়। এতে নাকি ভূত সমাজের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। ছোকরা ভূতেরা সব বখে যাচ্ছে। কী অজুহাত! মন্ত্রীর ভাষণের ধাক্কায় মহারাজ মত দিলেন। বেচারা গঙ্গাধর, মরার আগে ও তো বিখ্যাত হাড়ের ডাক্তার ছিল। ঘাড় মটকাতে গিয়ে দেখল ছোটকর্তার স্পন্ডেলাইসিস। ঘাড়টা চেপে ধরে আলতো করে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এবার দেখুন তো কেমন বোধ হচ্ছে, ছোটকর্তা তো ভূত দেখে পুড়ি মরি করে দে দৌড়। তবে ঘাড়টা ততক্ষণে একদম সেরে গেছে।

কিন্তু রাজসভায় গঙ্গাধরের বিচার হল। গঙ্গাধরের সাহস বটে। সবার মুখের ওপর বলে দিয়েছিল, 'আমাকে ঘাড় মটকাতে পাঠানো হয়েছিল, আমি মটকেছি, লোকটা মরল কী না মরল সেটা দেখার দায়িত্ব তো আমাকে দেওয়া হয়নি।' তবে বললে কী হবে গঙ্গাধরকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি স্বরূপ কাঁকরগঞ্জের গদাই ওঝাকে ঠেলা মারার কাজ দিলেন মহারাজ। যতই হোক 'ভূতের ঠেলা', গদাইয়ের নব্বই কিলো ওজন, ঠেলে নড়াতে পারে! মাঝখান থেকে গদাই মন্ত্র দিয়ে বেঁধে রেখে এমন মার মেরেছে তিনদিন ধরে বাবলা গাছে ঝুলে ঝুলে শিরদাঁড়া সোজা করছে গঙ্গাধর। ওদিকের মন্ত্রী মশাই বেজায় খুশি, গঙ্গাধরের শাস্তির মতো শাস্তি হয়েছে বলে। আমি আবার মন্ত্র না জানা সাধারণ মানুষের কাছে হেনস্থা হয়েছি। গোটা ভূত সমাজের মুখে চুনকালি দিয়েছি। আমার যে কত বড় শাস্তি হবে!"

"ভয় পেয়োনা তুমি ওষুধটা ভাল করে বানাও। রাজামশাই নিশ্চয় তোমার শাস্তি মকুব করে দেবেন।"

"তোমার কথায় ভরসা পেলাম। তা হলে তাই করি। কী বলো? অদৃশ্য হবার মন্ত্রটা বোধহয় এবার মনে পড়ে যাবে।" কালাচাঁদ চোখ বুজে কী সব বিড়বিড় করল। গোটা পরিবেশটা কেমন থমথমে হয়ে গেল। একটু পরে হুস করে হাওয়া। বাবন দেখল চারপাশ নিঝুম। তারপর সকালটা একদম আগের অবস্থায়। বাবন জগিং করতে করতে বাড়িতে এল। সবটা মনে করে আবার অবাক হল। সে ভূতের সঙ্গে গল্প করে ফিরেছে। তবে মামদোটার জন্য তার করুণা হল।

।। ২ ।।

পরদিন ভোর তিনটে থেকেই বাবনের ঘুমটা হালকা হয়ে গেল। রায়বাড়ির মাঠটা যেন বন্ধ চোখের তলায় ভেসে উঠতে লাগল। কেউ তাকে ডাকছে এমনটা মনে হওয়ায় বাবন কয়েকবার চোখ মেলে তাকিয়েও ফেলল। আবছায়া আলোয় ঘরের দেওয়াল সিলিং দেখে আবার চোখ বুজল। ঘুমনোর চেষ্টা করে করে ঘুম এল না। তাই একটু আলো ফুটতেই ড্রেস করে বেরিয়ে পড়ল। আজ এদিক ওদিক ঘোরার মন ছিল না। এক দৌড়ে সোজা রায়বাড়ি সংলগ্ন মাঠে। মাঠে আসতেই কালকের গাছটার দিক থেকে কে যেন ফিসফিস করে বলল, "এই যে, এই দিকে।" বাবন দেখল কালাচাঁদ। "যাক তুমি এসেছ! আমি তো তোমার জানলা পর্যন্ত গিয়েছিলাম, তুমি ঘুমোচ্ছ দেখে আর....।" বলতে বলতে কালাচাঁদ থেমে

গেল। কালকের চেয়ে আরও হতশ্রী দশা হয়েছে তার। বাবন সহানুভূতির স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "কী হয়েছে?"

কালাচাঁদ কিছু বলতে পারল না। ভেউভেউ করে কেঁদে ফেলল। তার চোখের জল গাল বেয়ে নেমে ঘাসে পড়ল। বাবন কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না তাই আবার জিজ্ঞাসা করল, "কী হয়েছে?"

কালাচাঁদ বলল, "কাল বিচারে আমাকে থাবড়াহাটের তান্ত্রিক তিরিক্ষিবাবাকে ভয় দেখাবার কাজ দেওয়া হয়েছে। তিনি বেতালসিদ্ধ তান্ত্রিক তার হাতে যে আমার কী দুর্দশা হবে!"

"কেন তোমার খাঁটি 'তৃশির' পেয়ে মহারাজ খুশি হননি?"

"সব ভেস্তে গেছে। কালো চুলের বিজ্ঞাপন দেখে তোমাদের কোন এক দোকান থেকে কী একটা তেল হাতিয়ে এনে মহারাজকে দিয়েছিল ব্রহ্মদৈত্য কবিরাজ। সেটা মাথায় মেখে মহারাজের বেজায় সর্দিকাশি। কাশতে কাশতে হাঁপিয়ে উঠছেন। মাথায় উলের টুপি পরে কাল সভায় এসেছিলেন। প্রেতিনিটা কিছুতেই মাথায় মাখিয়ে উঠতে পারেনি। নানা অছিলায় টুপি খোলার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় শেষে শিশিটা মহারাজের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। সভার কাজে অন্যমনস্ক মহারাজ সবটা একচুমুকে খেয়ে ফেলেছেন কাফ-সিরাপ ভেবে। একে 'তৃশির'-এর বিচ্ছিরি স্বাদ তার ওপর ভূতেদের সম্মান বিষয়ে মন্ত্রীর জোরদার সওয়াল। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম করলেন, 'মন্ত্রী, উৎসবের দিন কে কাকে ভয় দেখাবে তালিকা বানিয়ে সভায় ঝুলিয়ে দাও। কালাচাঁদ থাবড়াহাট যাবে তিরিক্ষিবাবাকে ভয় দেখাতে। ' ব্যাস হয়ে গেল আমার দফা রফা।" সবটা বলে কালাচাঁদ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

"তোমাদের উৎসব?"

"তাও জানো না। ভূতচতুর্দশী উপলক্ষে প্রতি বছর হয়। কত সব ভূতেরা আসে। জিন, যক্ষ, বেতাল, ড্রাকুলা। গোরস্থানের সাহেব ভূতেরা বিভিন্ন কায়দা দেখায়। গেঁয়োভূতেরা সারাবছর ধরে সেসব নকল করে। নানান ঘরানার নাচগান হয়। মোটা ভূতেরা ভুঁড়িতে তবলার বোল তোলে। আর চলে এক সপ্তাহ ধরে মানুষকে ভয় দেখানো মজা। বাচ্ছা ভূতেরা যারা ভয় দেখাতে ভয় পায়; তারা সূক্ষ্মশরীর ধারন করে মানুষের মাথায় চেপে বসে। এই জন্য মাথায় ভূত চাপলে মানুষ অমন ছেলেমানুষি করে। কে কোন মানুষকে ভয় দেখাবে তা মন্ত্রীমশাই ঠিক করে তালিকা বানান।"

"নিজে ভয় দেখাতে যান না?"

"উনি খুব চালাক। প্রতি বছর তোমাদের পাড়ার বিন্তিপিসিকে ভয় দেখিয়ে আসেন। একেই বুড়িমানুষ। ভয়ে ভয়েই থাকেন। তার ওপর ওনার স্বামীর নাম রাজা দশরথের বড়ছেলের নামে। পিসি প্রাচীন মানুষ, ভয় পেলেও স্বামীর নাম বলে ওই নামটা মুখে আনেন না। এতে মন্ত্রীমশাইয়ের আরো সুবিধা হয়।"

"ও হো! রাম নাম?"

এবার কালাচাঁদের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কষ্টেসৃষ্টে বলল, "চুপ করো। ওটা খুব খারাপ শব্দ আমাদের কাছে। শুনতে মানা আছে।"

"ঠিক আছে বলব না। তা উৎসবের সময় তোমাদের রাজামশাই ভয় দেখাতে বেরন না?"

"আগে খুব উৎসাহ ছিল। কত জাঁদরেল জাঁদরেল পালোয়ান মহারাজের ভয় দেখানোর চোটে অজ্ঞান হয়ে তবে ছাড়া পেয়েছে। সেদিন আর নেই। এখন মনমরা হয়ে গাছে উঠে বসেন আর তলা দিয়ে ঝাঁকড়া চুল, বা টিকিওয়ালা কেউ গেলে হাতটা লম্বা করে আচমকা তার চুল ধরে টেনে দেন। ওই একটাই কায়দায় আজকাল ভয় দেখান তিনি আজকাল।"

"এবছর উৎসবের আর কত দেরি?"

"আগামীকাল সন্ধে সাতটা বাজলেই শুরু। পরশুদিন অন্ধকার নামলেই আমাকে থাবড়াহাট যেতে হবে। আমাদের পাড়ার সবাই তো আনন্দ করে বলছে, 'ঠিক হয়েছে।' তোমার সঙ্গে তাই দেখা করতে এলাম মনটা একটু শান্ত হবে বলে। তান্ত্রিক আমায় বন্দি করে কোথায় পাঠাবে কে জানে।"

কালাচাঁদের কথায় বাবনের মন খারাপ লাগছিল। তাই সে চুপচাপ খানিকক্ষণ আকাশে দিকে তাকিয়ে ছিল।

বাবনের মৌনতা দেখে কালাচাঁদ বলল, "কী ভাবছ?"

"ভাবছি তিরিক্ষিবাবাকে কিভাবে ভয় দেখানো যাবে।"

"ওকথা ভুলেও ভেব না। আমি তো সামান্য মামদো। সে ছিল জবরদস্ত বেতাল। তিরিক্ষিবাবার ঝোলা থেকে তালের ফুলুরি চুরি করে খেতে গিয়ে ধরা পড়ল। তিরিক্ষিবাবা তাকে তিন চড় লাগিয়ে রান্না ঘরে বন্দি করলেন। সেই থেকেই তার জন্য আলুসিদ্ধ ভাত বেতালটাই রান্না করে। বেতালের হাতে সিদ্ধ খাবার খেয়ে খেয়েই মনে হয় উনি বেতাল সিদ্ধ হয়েছেন।"

"দেখো কালাচাঁদ কাউকে ভয় দেখতে হলে তার দুর্বলতাগুলো আবিষ্কার করতে হবে। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। আজকের দিনটা আমাকে একটু

তদন্ত করে দেখতে দাও। কাল সকালে তুমি এই সময় আমার সাথে দেখা কোরো। তোমাকে কী করতে হবে বুঝিয়ে দেব। তার আগে তোমাদের মন্ত্রীমশাইকে একটা শিক্ষা দেওয়া দরকার। তুমি ওর সম্পর্কে সব খোঁজখবর জোগাড় করো। কাল সকালে আমাকে জানাবে। এদিকে আমাকে একবার বিন্তিপিসির বাড়ি যেতে হবে। এবারেও উনি বিন্তিপিসিকেই ভয় দেখাবেন তো?"

"হ্যাঁ। তালিকা সভায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে। মহারাজ বলেছেন এবার তার মুড নেই ভূতচতুর্দশীর আগের দিন, মানে কাল সন্ধেবেলা মন্ত্রীমশাই ভয় দেখিয়ে উৎসবের সূচনা করবে।"

"ঠিক আছে। তাহলে আমি আসি। একদম হতাশ হয়ো না। মনে রেখো যারা ভাল তাদের সঙ্গে সবসময় ভালই হয়।"

।। ৩ ।।

বার দুই কড়া নড়তেই বিন্তিপিসি দরজা খুললো। বাবনের সঙ্গে বিন্তিপিসির তেমন পরিচয় নেই। পিসি পাড়ায় একা একা থাকেন। বাবন এটুকুই জানে। তবে বাবন কিছুক্ষণের মধ্যেই আলাপ জমিয়ে নিল। কথায় কথায় পিসেমশাইয়ের কথা উঠল। বাবনের জন্মের আগে থেকে পিসেমশাই নিখোঁজ। পিসেমশাইয়ের স্মৃতিচারণ করতে বসে বিন্তিপিসি চোখের জল মুছে বলল, "কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল! সে বছর রায়বাগানে নানা রহস্যময় কান্ড ঘটতে লেগেছিল। বুড়ো রায়কর্তা মারা যেতে তার সম্পত্তি নিয়ে কী সব গোল বেঁধেছিল। রায়কর্তার প্রথমপক্ষের দুই ছেলে বাঘাম্বর রায় আর পীতাম্বর রায়। দ্বিতীয়পক্ষের একছেলে নীলাম্বর রায়। বাঘাম্বর ছিল দাপুটে লোক, সারাপাড়া তাকে ভয় পেত, শোনা যায় তার সামনে দিয়ে জিরাফেও মাথা নিচু করে রাস্তা পার হত। পীতাম্বর তন্ত্র সাধনা করত। উনিই যতসব ভূতপ্রেত এনে অতবড় রায়বাগানটা ভূতমহল্লা বানিয়ে দিয়ে গেলেন। আর নীলাম্বর আসামী, তার অনেক বদনাম।

সে রাতে হঠাৎ নীলাম্বর রায় খুন হলেন। অবিশ্বাস্য কি জানো? এই লোকের তখন জেলে থাকার কথা। তার লাস পাওয়া গেল রায়বাগানে। চারদিকে সোরগোল। তোমাদের পিসেমশাই পুলিশ। ফলে তদন্তে নামলেন। বাঘাম্বর রায় আমাদের বাড়ি এসে এসে তদন্তের খবর নিয়ে যেতেন। বলতেন ও সব পীতুর পোষা ভূতেদের কাজ। নীলু জেল পালিয়ে বাগানে এসে ওদের বিরক্ত করেছিল হয়তো, রেগে গিয়ে ঘাড় মটকে দিয়েছে। রায়বাগানে অশরীরীদের কথা সবাই জানে কিন্তু তোমাদের পিসেমশাই এসব বিশ্বাস করতেন না।"

বাবনের মনে হচ্ছিল সে রীতিমত ডিটেকটিভ গল্প শুনছে। তাই আরো উৎসুক হয়ে বলল, "তারপর?"

পিসিমা একটু দম নিয়ে বলল, "সময়ে রহস্যের কিনারা না হওয়ায় সবাই কেসটা ভৌতিক ব্যাপার বলেই মেনে নিয়েছিল। তোমাদের পিসেমশাই মানেননি, তিনি রায়বাগানে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন কিছু সূত্র পাওয়া যায় কিনা। আমার আপত্তি ছিল। ভূতুড়ে ব্যাপার, কী থেকে কী হয়ে যাবে। আমার সঙ্গে এই নিয়ে ঝামেলা হত। যেদিন উনি ঘর ছাড়লেন তার আগের দিন আমার সঙ্গে তর্কাতর্কিও হয়েছিল। আমি বলেছিলাম, 'তালের বড়া খেয়ে খেয়ে খুব তালেবর হয়েছ!' তালের বড়া, ফুলুরি, লুচি এই সব খেতে যে কী ভালবাসতেন! সেদিন সন্ধেবেলা বাঘাম্বর রায় মারা গেলেন আর উনি রায়বাগান থেকে ফিরে বললেন, 'আসল রহস্যটা ধরে ফেলেছি।' বলেই টলে পড়ে গেলেন। তুলতে গিয়ে দেখলাম মাথাটা অসম্ভব ভারী। ডাক্তার এল, ওষুধ দিল, বলল, 'ভয়ের কিছু নেই।' সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম দরজা হাট করে খোলা। উনি নেই। সেই থেকে কত খোঁজা খুঁজি। এই কাল সূয্যি উঠলে পাক্কা পনের বছর হবে।" একটা বিষণ্ণ নিঃশ্বাস ফেলে পিসি থামল।

"আর পীতাম্বর রায়? তার কী হল?"

"ওই ঘটনার কিছুকাল পরে পীতাম্বরকে কারা ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দেয়। বুঝলেই পারছ আমি কাদের কথা বলছি। রায়বাগান বড় খারাপ জায়গা বাবা ওপথ ভুলেও মাড়িও না। ওনাকে বিবাগী করেও তেনাদের শান্তি হয়নি। প্রতি বছর এসময় আমাকে প্রায় প্রাণে মেরেই ফেলে। কদিন তাই খুব আতঙ্কে কাটাচ্ছি।" পিসির মুখটা দুশ্চিন্তার মেঘে ডাকা পড়ল। বিন্তিপিসিকে অনেক নির্ভয় বার্তা শুনিয়ে—'কাল আবার আসব'—বলে বাবন বাইরে এল। এখন তার মাথায় অনেক ক্লু ঘুরঘুর করছে। সেগুলো একজায়গায় মেলাতে পারলেই হয়তো কালাচাঁদকে রক্ষা করা যাবে।

পরদিন আলো ফুটতেই বাবন যথাস্থানে এসে দেখল কালাচাঁদ একা নয় সঙ্গে ঘোমটা মাথায় এক ভদ্রভূতনিও এসেছে।

কালাচাঁদ আলাপ করিয়ে দিতে বলল, "এই সেই প্রেতিনি। বাতাসি। মহারাজকে বাতাস করে। ও মন্ত্রী মশাই সম্পর্কে কিছু গোপন খবর জানে। বলতে রাজি আছে। তবে ওর একটা আবদার আছে।"

বাবন বুদ্ধিমান ছেলে, তৎক্ষণাৎ কথা কেড়ে নিয়ে বলল, "ওই বাচ্ছাটাকে একবার শ্যাওড়া তলায় নিয়ে

গিয়ে বাঁশি বাজাতে বলতে হবে এই তো? আমি সামনের রোববার দুপুরে সব ব্যবস্থা করে দেব।"

প্রেতিনিটা ঘোমটার আড়াল থেকে বলল, "প্রমিস?"

কালাচাঁদ বলল, "বাতাসি একমাত্র তোমাকেই বলতে চায়। আমার ওপর ওর বিশ্বাস নেই। কথাটা পাঁচকান হলে ওর সমূহ বিপদ হতে পারে।"

বাতাসি কালাচাঁদকে হাত দেখিয়ে দূরে যেতে ইশারা করল। তারপর নিচু স্বরে বাবনকে বলল, "তুমি মানুষ তোমাকে বললে এসব রাষ্ট্র হবার ভয় নেই। যদিও মন্ত্রীমশাইয়ের কিছু পরে আমি ভূতজগতে এসেছি। তবু আমি রাজসভায় চাকরি করি বলে অনেক কিছুই জানি। মানুষবেলাতেও উনি খারাপ মানুষ ছিলেন এবং তখনই ভূত ধরতে পারতেন বলে শুনেছি। আমি নিজের চোখে দেখেছি কিভাবে বারো জন ছোকরা ভূতকে এ অঞ্চলছাড়া করেছেন। সম্ভবত ওদের দিয়ে মানুষবেলায় কোনও খারাপ কাজ করিয়েছিলেন। আগের মহারাজ ছিল ওর হাতের পুতুল। সে সময় রাজ্যের সমস্ত ভূতেদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করে ওর বিরুদ্ধে মুখ খোলা একদম বন্ধ করিয়ে দিয়েছে। এই মহারাজ তো সেদিনের লোক। কালাচাঁদ আসার কয়েকমাস আগে বদলি হয়ে এখানে এসেছেন। মহারাজাধিরাজ যক্ষরাজ এখানকার রাজ্যে ভূতেদের কুকর্ম বেড়েছে খবর পেয়ে সৎ ভূত বলে বর্তমান মহারাজকে পাঠান সুশাসনের জন্য। প্রথমদিকে ভালই হাল ধরেছিলেন। কিন্তু এখানকার জলহাওয়া সহ্য হল না। চুল উঠতে লাগল। ফলে টাক পড়ছে টাক পড়ছে করে কাজে মন বসে না ঠিক মতো। ব্যাস আবার মন্ত্রীমশাইয়ের রমরমা।"

কালাচাঁদকে রক্ষা করতে হলে বাবনকে আজকের মধ্যেই সমাধান করতে হবে। সময় কম, তাই অপ্রাসঙ্গিক কথা কমাতে বলল, "কিন্তু গোপন খবরটা কী?"

বাতাসি তিনশো ষাট ডিগ্রী ঘাড় ঘুড়িয়ে চারপাশ দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, "মন্ত্রীমশাইয়ের নাম ভূতসমাজে কেউ জানে না। আমিও না। মহারাজও না। আসল খবর হল মন্ত্রী মশাই রায়বাড়িই লোক। বাগানটা ওদের বলে মন্ত্রীপদটা ওদের বাড়ির কাউকেই দেওয়া নিয়ম। এই কারণেই এখানকার ভূতেদের রায় বাড়ির কাউকে ভয় দেখানো মানা আছে। রায়বাগানে আমাদের সবাই যায় এটা ওটা করতে। রায় বাড়ির কেউ টের পায়? নিজের বংশধর বলে মন্ত্রীমশাই এই ব্যবস্থা করিয়ে নিয়েছেন। কাজের লোক পর্যন্ত এর আওতায়। নাহলে ঝাড়ুমতির এত বাড় বাড়ে! কালাচাঁদকে ঝাটা পেটা! মামদো বলে চিনতেই পারেনি।"

"কিন্তু পনের বছর আগে তো রায় বাড়ির তিন ভাই কিছুদিন অন্তর অন্তর মারা গিয়েছিল....বাকিরা গেল কোথায়?"

"সেটাই রহস্য। আর এই ভূত রাজ্যের সবচেয়ে বড় রহস্য হল যার নামে সবাই থরহরি কম্প সেই তিরিক্ষিবাবার কাছে মন্ত্রীমশাইয়ের মাঝে মাঝে যাওয়া। কিন্তু এই নিয়ে তদন্ত করার বুদ্ধি ভূতেদের কারো নেই। কালাচাঁদ বলেছিল, আমিও দেখলাম তুমি ভীষণ সাহসী ও বুদ্ধিমান। দেখ তুমি কিছু কিনারা পাও কিনা।"

বাবন বলল, "সমাধান যা করার তোমরাই করবে। আমি শুধু একটু এগিয়ে দেব। কালাচাঁদকে ডাকো। কথা আছে।"

বাতাসি এক ধরনের আওয়াজ করতেই কালাচাঁদ হাজির। বাতাসি ঘোমটাটা টেনে বলল, "আমি যাই, কাজ আছে। মহারাজ আবার গত কয়েকদিন কেবল ঘুমোচ্ছেন। কী যে হল কে জানে!"

বাতাসি চলে যেতে বাবন কালাচাঁদকে বলল, "আজ সন্ধেবেলা আমি বিন্তি পিসির বাড়ি যাব। তুমিও সঙ্গে থাকবে। আমাকে কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য করে দিতে হবে। পারবে?"

"খুব পারব। তুমি থাকলে আমার একটুও টেনসন হয় না। সব মন্ত্র ঠিকঠাক মনে থাকে।"

।। ৪ ।।

বিকেলে স্কুল ছুটি হতেই বাবন দ্রুত সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরল। তারপর জন্মদিনে গিফট পাওয়া 'ডিজিট্যাল ভয়েস রেকর্ডার'টা শোকেস থেকে বার করল। এরপর একটা নিস্তব্ধ ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে রের্কড করল, "রাম। রাম। এই রাম কী করছিস? এই রাম ছুটছিস কেন?" নির্দিষ্ট সময়সীমা তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে এটুকুই রের্কড করতে পারল সে। এরপর মেশিনটা রিপিট মোডে দিতে কথাগুলো বারবার বাজতে লাগল। বাবন মনে মনে বলল, 'দারুন হয়েছে।'

সন্ধে হতে বাবন কালাচাঁদকে নিয়ে বিন্তিপিসির বাড়ি গেল। বাবন কালাচাঁদকে সাবধান করে বলল, "বেশি নড়াচড়া কোরো না। ওই আড়ালটায় লুকিয়ে পড়। তোমাকে দেখলে পিসি ভয় পেয়ে যাবেন। আর মন্ত্রীমশাই আসার সময় হলেই আমাকে অদৃশ্য করে দেবে। কেমন?"

কালাচাঁদ ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানাল।

পিসি বাবনকে কাছে পেয়ে ভরসা পেলেন। এটা ওটা গল্প করতে করতে পিসেমশাইয়ের গোয়েন্দা বইয়ের কালেকসান ঘুরিয়ে দেখালেন। তারপর বাবনকে একট

চেয়ার টেনে দিয়ে বললেন, "বোসো, তোমার জন্য নারকেল নাড়ু করেছি নিয়ে আসি।" পিসি রান্না ঘরের দিকে যেতেই একটা সরু হাওয়ার স্রোত পাতায় পাতায় খেলে গেল। বিন্তিপিসির উঠোনের কাঁঠাল গাছের একটা ডাল খানিকটা ঝুকে পড়ল। বাবন সঙ্গে সঙ্গেই দেখলে সে নিজের হাত পা আর দেখতে পাচ্ছে না। সে অদৃশ্য হয়ে গেছে। যাচাই করতে সে আয়নার দিকে এগোল। না কোন প্রতিবিম্ব নেই। এদিকে জানলার পর্দাটা কেঁপে উঠল। একটা ছায়া সরে সরে ঘরের মাঝখানে আসছে। ছায়াটা হাতটা সোজা করতেই জানলাগুলো দুমদাম আওয়াজ করে খোলাবন্ধ হতে লাগল। বিন্তিপিসি নাড়ুসমেত ডিস হাতে কী হচ্ছে দেখতে জলদি ঘরের দিকে আসছেন। ঘরের টিউব, বাল্ব নিভে গিয়ে জ্বলে উঠল। বাবন সেই টুকরো অন্ধকারে দেখে নিল ছায়ার গায়ে রাজকীয় পোশাক। ইনি নিশ্চয় মন্ত্রীমশাই। বাবন পা টিপে টিপে ছায়ার কাছে এগিয়ে গেল। পোশাকের পকেটটা কোথায়? পিসি ঘরে আসতেই মন্ত্রীমশাই নিজ রূপে প্রকট হলেন। মুলোর মতো দাঁত বার করে এক হাড় হিম করা হাসি হাসলেন। পিসির হাত থেকে ডিস মাটিতে পড়ে আওয়াজ করে ভাঙল। পিসির চোখের মণি স্থির। আরো দর্শক যেন গাছে বসে মজা লুটছে। মন্ত্রীমশাই হাত ঘুরিয়ে ঝড়ের মতো হাওয়া সৃষ্টি করলেন। মনে হচ্ছিল চেয়ার টেবিল সব উড়ে যাবে।

এদিকে বাবান ছায়ার একদম পাশে। কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। এই তো পকেট। বাবন ভয়েস রের্কডারটা অন করে টুপ করে সেটা ছায়ার পকেটে ভরে দিল। পিসি ঠকঠক করে কাঁপছেন। হয়তো এক্ষুনি জ্ঞান হারাবেন।

এমন সময় কে বলে উঠল, "রাম। রাম। এই রাম কী করছিস? মন্ত্রীমশাই কয়েক সেকেন্ড থ মেরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ছুটে গিয়ে জানলা দিয়ে নীচে লাফ। এবার কেউ তাকে বলল, "এই রাম ছুটছিস কেন?" মন্ত্রীমশাই উড়ে গিয়ে পাঁচিল টপকে মাঠ বরাবর দৌড় লাগালেন।

বাবন হাঁক দিল, "কালাচাঁদ আমাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দাও। আর জলদি যাও ওই মন্ত্রী ভূতের পিছনে।" মুহূর্তে বাবন দেখল সে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে টের পেল একটা হাওয়া জানলা দিয়ে দ্রুত বাইরে চলে গেল, জানলাটা দড়াম করে বন্ধ করে।

বাবন তাড়াতাড়ি বিন্তিপিসিকে ধরে চেয়ারে বসাল। এক গ্লাস জল নিয়ে সামনে ধরল। পিসি জল খেয়ে ধাতস্থ হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "এসব কী হচ্ছে বাবা?"

বাবন আশ্বাস দিল, "কিছু না। খেলা শেষ। এরপর কোনওদিন কেউ আপনাকে উৎপাত করতে আসবে না।" তারপর বলল, "আপনি রেস্ট নিন। আটটা বেজে গেল। আমি আসি। না হলে বাড়ির লোকে আবার চিন্তা করবে।"

।। ৫ ।।

পরের ঘটনা বাবন কালাচাঁদের মুখে শুনেছিল। সংক্ষেপে বললে—মন্ত্রীমশাই তো পাগলের মতো দৌড়াদৌড়ি করছিলেন। তার পকেটে কেবলই বেজে চলেছিল, "রাম। রাম। এই রাম কী করছিস? এই রাম ছুটছিস কেন?" এই শব্দগুলো থেকে নিস্তার পেতে মন্ত্রীমশাই হাঁপাতে হাঁপাতে থাবড়াহাটে তিরিক্ষিবাবার ডেরায় গিয়ে লুটিয়ে পড়লেন। 'রাম। রাম।' শব্দগুলো তখনও সমানে বেজে চলেছে। ওদিকে ভূতের মুখে (?) রাম নাম শুনে তিরিক্ষিবাবার তো চক্ষু ছানাবড়া। হঠাৎ তিনি আসন ছেড়ে উঠে 'আমি রাম। আমি রাম।' বলে মাথায় হাত চেপে বসে পড়লেন। কী আশ্চর্য কান্ড—পলকের মধ্যে তিরিক্ষবাবার মাথার সাদা চুল খাড়া হয়ে উঠে শরতের কাশবনের মতো দুলতে লাগল। আর সেখান থেকে বেরিয়ে এল সূক্ষ্মশরীরের আর একটা ভূত। সে মন্ত্রীমশাইকে পাকড়ে ধরে—আমার শরীর ফিরিয়ে দে। আমার শরীর ফিরিয়ে দে—বলে চিৎকার জুড়ে দিল। তবে রাম নামের ধাক্কায় দুই ভূতেরই তখন করুণ অবস্থা। কালাচাঁদ কানে আঙ্গুল চেপে কোনওরকমে সবটা দেখে এসেছে।

এদিকে পরদিন বাবনদের গ্রাম মাদলপুর তোলপাড়। তিরিক্ষিবাবা সেলুনে গিয়ে চুলদাড়ি কেটে গ্রামে ফিরে এসেছেন। বয়স বাড়লেও লোকজন তাকে চিনতে পেরেছে। তিনি যে গ্রামের বিন্তিপিসেমশাই। পিসি তাকে সামনে পেয়ে কিছুক্ষণ বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। তার চোখ দিয়ে দেদার জল গড়াতে লাগল। পনের বছর পর পিসেমশাই বাড়ি ফিরলেন।

সেদিনই রাত ন'টা নাগাদ বাবান ছাদে উঠেছিল। মাঝে মাঝে পড়ার ফাঁকে সে আকাশে তারা দেখতে যায়। কালাচাঁদ লাফিয়ে এসে ভয়েস রেকর্ডারটা বাবনের হাত দিয়ে বলল, "এই নাও তোমার যন্ত্র। বাপরে! কাউকে কাছে ঘেঁসতে দেয় না। কী ভাগ্যি থেমেছে।"

বাবন বলল, "ব্যাটারী ফুরিয়ে গেছে। তা রহস্য সমাধান করতে পারলে?"

কালাচাঁদ মস্ত সম্মতি জানিয়ে বলল, "হ্যাঁ। সব রহস্যের সমাধান করে ফেলেছি। আমাদের মন্ত্রীমশাই হলেন পীতাম্বর রায়। মানুষ অবস্থায় দাদা বাঘাম্বরের সাথে ষড়যন্ত্র করে সৎভাই নীলাম্বর রায়কে মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে জেলে পাঠিয়েছিলেন। যাতে সম্পত্তির ভাগ দিতে না হয়। শেষ বয়সে বুড়ো রায়কর্তা সে কথা জানতে পেরে নীলাম্বরকে সব সম্পত্তি দেবেন মনস্থ করে জেল থেকে গোপনে ছাড়িয়ে আনেন ও দাদাদের বিরুদ্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে বলেন। খবর পেয়ে দুই ভাই মিলে নীলাম্বরকে খুন করে ভূতেদের নামে দোষ দেয়। পীতাম্বরই রায়বাগানে ভূত পুষেছিলেন। তাদের দিয়ে সব কাজ কর্ম করাতেন। বিন্তিপিসেমশাই তদন্ত করতে নেমে মিথ্যে মামলার ব্যাপারটা ধরে ফেলেন, সেই সঙ্গে এও জানতে পারেন যে পীতাম্বর দাদা বাঘাম্বরকেও সরাবার ফন্দি করছে। পিসেমশাই এই কথা বাঘাম্বরকে বলে নিজেদের মধ্যে গন্ডগোল লাগিয়ে দিয়ে দুটোকেই জেলে ভরার প্লান করেছিলেন।"

"তাই?" বাবন বিস্ময় প্রকাশ করল।

'এক বয়স্ক ভূতের থেকে খবর নিয়ে পঁচিশ ক্রোশ উড়ে ঘন্টঘাটায় গিয়ে আজ বিতাড়িত সেই বারোভূতের সঙ্গে দেখা করে এলাম যে। ওরাই সব ঘটনা বলল।

বাঘাম্বর রাগী লোক সে ভাইকে এই নিয়ে শায়েস্তা করতে গেলে ভূতেদের সাহায্যে তাকে মেরে ফেলা হয়। ভূতগুলো আজ খুব দুঃখ করে বলছিল, ভয় দেখিয়ে এই কাজে তাদের বাধ্য করা হয়েছিল। পীতাম্বরের সাথে এক বিদঘুটে তান্ত্রিকের পরিচয় ছিল। নানা ব্ল্যাক যাদুমন্ত্র পীতাম্বরকে শিখিয়েছিল সে।

পিসেমশাই ভূত মানতেন না। তিনি ভেবেছিলেন বাঘাম্বর শক্তিমান লোক সেই পীতাম্বরকে জব্দ করবে। সেই প্রমাণ উদ্ধার করতে তিনি সেই সময় বাগানে এসে পড়লে বাঘাম্বরের প্রেতাত্মার সূক্ষ্মশরীরকে পিসে-মশাইয়ের মাথায় চাপিয়ে দেন পীতাম্বর। ও সেখানেই তাকে এতকাল আটকে রেখেছিলেন। মাথায় ভূত চাপার ফলে তো পিসেমশাই এতগুলো বছর সন্ন্যাসী হয়ে কাটালেন।"

বাবন অবাক হয়ে শুনছিল।

কালাচাঁদ উৎসাহ নিয়ে বলল, "এই বাঘাম্বর মাথায় চেপে থাকার জন্যই বোধহয় তিরিক্ষিবাবার অমন তিরিক্ষে

মেজাজ ছিল। ওদিকে বেচারা বারো ভূত! তারা এমনিতেই দিনরাত বেগার-খাটনির চোটে মনিবের ওপর চটে ছিল। তার ওপর দিনের পর দিন খুনের বদনাম বয়ে বেড়ানোর অপমান তাদের অসহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সম্পত্তি একা পাওয়ার আনন্দে পীতাম্বর তন্ত্র সাধনা ছেড়ে বিলাসী হয়ে উঠছিল। তার মন্ত্র শক্তির জোর কমছে দেখে বারোভূত মুক্তির আশায় একদিন পীতাম্বরকে ছাদে অন্যমনস্ক পেয়ে ঠেলে ফেলে দেয়।''

এই পর্যন্ত বলে কালাচাঁদ বাবনকে প্রশ্ন করল, ''আচ্ছা, তুমি কী করে বুঝলে যে তিরিক্ষিবাবাই বিন্তিপিসেমশাই?''

বাবনের মনে হল মা ঘর থেকে ডাকছেন। তাই চলে যেতে যেতে কালাচাঁদের দিকে ঘুরে বলল, ''ওই যে, 'তাল সে তাল মিলা।'''

।। ৬ ।।

পরদিন ভোরবেলা বাবনের সঙ্গে কালাচাঁদের দেখা হল। সে আগের মতোই উবু হয়ে বসে শিশিতে শিশির ভরছিল। বাবন ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল, ''আবার কী হল?'' কালাচাঁদ একগাল হেসে বলল, ''কিছু হয়নি। জ্ঞান বুদ্ধি যাচাই করে নীলাম্বর রায়কে মহারাজ নতুন মন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত করেছেন। তিনি নির্বাসিত হয়ে ঘন্টঘাটায় চলে গিয়েছিলেন। সেখানে অনেক ভাল ভাল কাজ করেছেন। আজ তার অভিষেক। সেই উপলক্ষে আজ সবাইকে 'তৃশির' খাওয়ানো হবে। মহারাজ আমাকে সেই 'তৃশির' বানানোর দায়িত্ব দিয়েছেন।

সেদিন সভায় উনি ভুল করে খেয়ে ফেলেছিলেন না? তাতেই নাকি দারুন উপকার পেয়েছেন। খাওয়ার পর কদিন খুব ঘুম হয়েছিল। জেগে উঠে ওনার মনে হয় মনমরা হয়ে থেকে থেকে খুব ভুল করছেন। এখন সবেতেই ওনার উৎসাহ লাগছে। আমায় ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'আজ সবাইকে ওই ওষুধ খাওয়াব। তুমি বানিয়ে আনো। সবার মধ্যে কাজের উদ্যম চাই। কাজের কাজ বহুত আছে। শুধু শুধু গাছে বসে অলসভাবে সময় কাটাচ্ছে সব।' আমাকে উনি ভেবেচিন্তে ভালকাজের একটা ফর্দ বানাতেও বলেছেন। মহারাজ অনেক বদলে গেছেন। আসার সময় দেখে এলাম রায়দিঘির পাড়ে ঘুরেঘুরে কবিতা আবৃত্তি করছেন, '' '...কাঁসিও ভাল ঢাকও ভাল, টিকিও ভাল টাকও ভাল,....'।''

বাবন হেসে বলল, ''তাহলে তুমি একটা কাজের কাজ পেয়েছ বলো?''

''তা। বটে। তবে পুরোনো মন্ত্রীটার জন্য খারাপ লাগে। ওর নাম তো কেউ জানত না। তোমার যন্ত্রের ধাক্কায় সবাই ধরে নিয়েছে ওর নাম বুঝি দশরথের বড়ছেলের নামে। বুঝতেই পারছ ওকে ওই নামে ডাকার মতো ভূতসমাজে কেউ নেই। নাম পরিচয় হারিয়ে বেচারা এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে।''

''যাকগে, ও নিজেকে শোধরাক। ভাল-কাজ করলে নিজেই নিজের পরিচয় খুঁজে পাবে।''

''আজ জানলাটা খুলে রেখ। জোনাকি সাজিয়ে তোমাকে একটা মজার জিনিস দেখাব।'' এই বলে কালাচাঁদ শিশিরের সুগন্ধ ছড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। বাবনও মস্তিতে পা চালিয়ে এগিয়ে চলল। কাউকে সাহায্য করতে পারার মধ্যে যে কী আনন্দ!

ছবি: ওয়াসিম হেলাল

কয়েকটা দিন মাথাগোঁজার জন্য গ্রামের বাইরে এমন একটা নির্জন পোড়ো বাড়ি পেয়ে নন্দ বেজায় খুশি। শুকনো ডালপালা আর কঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট্টো বাড়িটার উঠোন পেরিয়ে মাটির দাওয়ার কোলে দুটিমাত্র মাটির ঘর। ঘর আর বারান্দার মাথায় গোলপাতার ছাউনি। একটি ঘরের দরজা খোলাই ছিল, হয়তো নন্দর জন্যই। খোলা ঘর আর দাওয়া ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে কাছের দিঘির টলটলে জলে স্নান করে এল নন্দ। বারান্দার একপাশে কেরোসিনের স্টোভ জ্বেলে ছোটো মাপের একটা অ্যালুমিনিয়াম হাঁড়িতে দুটো ভাতে ভাত ফুটিয়ে নিল সে, সঙ্গে আলুসেদ্ধ, ডালসেদ্ধ, শিমসেদ্ধ। রান্নাবান্নার সব সরঞ্জাম তার সঙ্গেই থাকে। গাঁয়েঘরে হোটেল থাকে না, থাকলেও ট্যাঁকের কড়ি ফেলে সেখানে খাওয়ার সামর্থ্য নেই তার।

দক্ষিণমুখো দাওয়ার কিনারে চওড়া একফালি রোদ্দুর, থাকবে এখনও অনেকক্ষণ। বহুরূপীর সাজপোশাকগুলো সযত্নে রোদে মেলে দিল নন্দ। রান্না শেষ, অথচ এখনও খিদে পায়নি তার। হাতে আপাতত কোনও কাজও নেই তার। নন্দ তখন উপেন্দ্রকিশোরী ছোট্ট রামায়ণটা বার করে সুর করে গাইতে শুরু করল :

সরযূ নদীর তীরে অযোধ্যা নগর,
দেবতার পুরী হেন পরম সুন্দর।
সোনা মণি মুকুতায় করে ঝলমল,
ছায়া লয়ে খেলে তার সরযূর জল।
বড়ো ভালো দশরথ সে দেশের রাজা,
দুঃখী জনে দেন সুখ, শঠে দেন সাজা।

হঠাৎ বাধা পেল নন্দ। কে যেন বলে উঠল, বেশ আমায়ণ গাইতে পারো তো বহুউপী!

নন্দ চমকে উঠে তাকিয়ে দেখল, উঠোনে দাঁড়িয়ে আছেন একজন বৃদ্ধ মানুষ। তাঁর মাথায় চুল অল্প, কিন্তু মুখে লম্বা দাড়ি। বলা বাহুল্য, বৃদ্ধের চুলদাড়ি সবই সাদা। হাওয়ায় উড়ুউড়ু। পরনে সাদা ফতুয়া আর ধুতি। পা-দুখানা খালি। চোখেমুখে মিষ্টি হাসি। বললেন, এ বাড়িতে বহুদিন জনমনিষ্যির গন্ধ নেই। আস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, মানুষের গলা শুনে ঢুকে পড়লাম। খাসা বহুউপীর সাজপোশাক তো তোমার। তা, আমাদের বিগড়ি-গাঁয়ে এই প্রথম এলে বুঝি?

—আমি বহুরূপী, সেটা বুঝলেন কী করে?

—কথাতেই আছে, অতনে অতন চেনে। আমিও যে একজন বহুউপী। বোঝাই যাচ্ছে অনেক দূর থেকে এসেছ। এখন খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করো। পরে আবার আসব।

পরদিন সকালে নন্দ রয়েল বেংগল বাঘ সেজে গাঁয়ের পথে বেরিয়ে বাঘের মতোই চার-পায়ে হাঁটতে লাগল। ওটাই তার রীতি। যেখানেই সে যায়, প্রথমদিন বাঘ সেজে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। পরে অবিশ্যি শিবঠাকুর, মা-কালী, কেষ্টঠাকুর সবই সে সাজে।

বাঘ দেখে লোকজন বেজায় ভয় পেয়েছে মনে হল। তাড়াতাড়ি যে যার বাড়িতে ঢুকে পড়ে ঝাঁপ আটকে দিল। একটু পরে নন্দ দেখল নানান বয়সী বেশ কয়েকজন মহিলা হাতে সড়কি, বল্লম, লাঠি, খুন্তি উঁচিয়ে তার পিছনে পিছনে মার মার করে তেড়ে আসছেন। সমূহ বিপদ বুঝে নন্দ দু-পায়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর মুখ থেকে বাঘের মুখোশটা খুলে ফেলে দু-হাত

জোড়া করে বলল, আমাকে মারবেন না। আমি বাঘ নই, আমি নন্দ বহুরূপী।

মেয়েদের রাগ কমল না। তাঁরা বললেন, তেত্রিশ কোটি দেবদেবী থাকতে বাঘ সেজেছ কেন? বাঘের মতো পাজি জানোয়ার দুটি নেই। আমাদের কারও বাবা নেই, কাকা নেই, স্বামী নেই, শ্বশুর নেই, ভাই নেই, ছেলে নেই। সব্বাইকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে।

পুরোনা শোকে মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন।

নন্দ কার কাছে যেন শুনেছিল সুন্দরবন অঞ্চলে কোন একটা গ্রামের সব পুরুষমানুষ বাঘের পেটে চলে গিয়েছে। তাহলে বিগড়ি-গাঁ-ই সেই গ্রাম! নন্দ বলল, আমার ঘাট হয়েছে। এবারের মতো আমাকে মাপ করে দিন।

পরদিন শিবঠাকুরটি সেজে বের হল নন্দ। তার সারা গায়ে ছাই মাখানো, মাথায় জটাজূট, পরনে বাঘছাল রঙের কাপড়। তার গলায় প্লাস্টিকের সাপ জড়ানো আর হাতে একটা ত্রিশূল। দু-একজন বয়স্ক মহিলা তাকে ভক্তিভরে প্রণামও করলেন। কয়েকটি বাচ্চা মেয়ে তো মহা উৎসাহে তার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছুটা পথ চলে এল।

অবশেষে নন্দ বলল, এবার যাও, মায়েদের কাছ থেকে আমার জন্যে চালডালের সিদে আর পয়সাকড়ি চেয়ে আনো।

মেয়েরা এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। নন্দ আবার বলল, কী হল, যাও, আমার জন্যে সিদে কিংবা পয়সা নিয়ে এসো। দেরি হয়ে যাচ্ছে। আশপাশের গ্রামগুলোতে যেতে বাকি এখনও।

পরনে ডুরে শাড়ি আর নাকে নোলক পরা বছর সাতেকের একটা ঝগড়ুটে মেয়ে বলল, বরং সেখানেই যাও তুমি। কেমনধারা বহুরূপী তুমি, আমাদের কাছে চাল, ডাল, পয়সা চাইছ? দা-ঠাকুর তো কখনও কিচ্ছু চায় না, বরং আমাদেরই দেয়। দা-ঠাকুরের ঝুলিতে কী না থাকে! চাল, ডাল, ওষুধপত্র, জামাকাপড়, বইখাতা— আমাদের যখন যা কিছু দরকার দা-ঠাকুর তার ঝুলি থেকে তা-ই বের করে হাতে হাতে তুলে দেয়।

আরেকটা মেয়ে বলল, পারো তুমি দা-ঠাকুরের মতন ঘন ঘন সাজ বদল করতে?

নন্দ বলল, কী রকম শুনি!

—তুমি তো এখন শিবঠাকুর। মনে করো আমরা বললাম—এবার তুমি কেষ্টোঠাকুরটি হও। তুমি বললে—তোরা চোখ বন্ধ কর। নিমেষ পরে চোখ খুলে দেখি তোমার জায়গায় দাঁড়িয়ে মাথায় মুকুট-পরা কেষ্টোঠাকুর মোহনবাঁশি বাজাচ্ছে। আবার পলক ফেলে দেখি কেষ্টোঠাকুরের বদলে স্বয়ং মা-কালী জিভ বের করে দাঁড়িয়ে আছে। কই, পারো তুমি দা-ঠাকুরের মতন এমনটা করতে?

নন্দ বুঝল যে-গাঁয়ে দাদা-ঠাকুরের মতো গুণী বহুরূপী আছেন, সেখানে আর সময় নষ্ট করা বৃথা।

পরদিন সকালবেলায় চলে যাবার আগে পোড়োবাড়ির দাওয়ায় বসে নন্দ তার জিনিসপত্র গোছগাছ করছে, এমন সময় সেই বৃদ্ধ এসে হাজির। মুচকি হেসে বললেন, কেমন লাগল আমাদের বিগড়ি-গাঁ?

মনে মনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল নন্দ। তাঁর জন্যই তার এমন মন্দ কপাল। কিন্তু মুখে কোনও রাগ প্রকাশ করল না সে। বরং মিষ্টি কথায় দাদা-ঠাকুরকে সন্তুষ্ট করে তাঁর বিদ্যের একটুখানিও শিখে নিতে পারলে আখেরে লাভ তারই।

নন্দ বলল, বিগড়ি-গাঁয়ে এসে বুঝতে পারছি এতদিন যা করেছি তা রং মেখে সং সাজা ছাড়া আর কিছুই নয়। দয়া করে দিন-না শিখিয়ে ঘন ঘন রূপ পরিবর্তনের বিদ্যেটা! সারা জীবন আপনার কাছে ঋণী থাকব।

দা-ঠাকুর কাষ্ঠ হেসে বললেন, এ বিদ্যে শিখতে হলে বড়ো কঠিন দক্ষিণা দিতে হয়। তুমি সংসারী মানুষ। তুমি কি পারবে?

নন্দ বলল, একশবার পারব।

দাদা-ঠাকুর বললেন, একশবারের দরকার নেই, একবারই যথেষ্ট। তোমার মানুষী দেহটা তুমি একবারই ত্যাগ করতে পারবে।

শিউরে উঠল নন্দ। বহুরূপীর বিদ্যে রপ্ত করতে গিয়ে প্রাণটা খোয়াতে পারবে না সে! বহুদূরে বর্ধমানের গ্রামে তার বুড়ো মা-বাবা, বউ, ছেলেমেয়েরা, গোয়ালে রাঙা গাই আর তার একচিলতে ধানখেতে সদ্য লাগানো কচি ধানগাছেরা অপেক্ষা করছে সে কবে বাড়ি ফিরবে তারই অপেক্ষায়।

দাদা-ঠাকুর বললেন, এ-বিদ্যে তোমার জন্যে নয় হে! চলি এখন।

নন্দ দেখল দাদা-ঠাকুর যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এক নিমেষে সেখানেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। শুধু কিছুটা সাদা ধোঁয়া পাক খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে বাতাসে মিলিয়ে গেল।

ছবি: নীতিশ মুখোপাধ্যায়

সেই রাত

লায়লী দাশ

সেদিন পয়লা আষাঢ়। প্রতিবছরের মত এবারও আমাদের 'কিম্ভুত' ক্লাবের সদস্যদের গল্পপাঠের আসর বসেছে। এক এক বছর এক একজন সদস্যের বাড়িতে এই দিনে আমরা একত্রিত হই। এবার বিশ্বদীপ অর্থাৎ তোতনের পালা।

'কিম্ভুত' ক্লাবের সদস্য সংখ্যা বারো। সদস্য ছাড়াও যে কেউ ইচ্ছে করলেই এই সভায় অতিথি হিসেবে যোগ দিতে পারবে। কিন্তু একটা শর্ত আছে। তাদের সকলকে একটা করে গল্প পাঠ করতে হবে। ভূতের গল্প। পাঠ করতে না চাইলে মুখে মুখেও বলা চলবে। দশজন ও তিনজন অতিথি মিলে আজ উপস্থিতির সংখ্যা তেরো।

সভা শুরু হওয়ার নির্দিষ্ট সময় সন্ধ্যা ছ'টা। পনেরো মিনিট পার হয়ে যেতে তোতন বলল, 'এবার শুরু করে দেওয়া যাক।'

'তেরো জনে কি শুরু করা উচিৎ? আরও একজন অন্ততঃ আসুক।' খুঁত খুঁত করে মাধব।

'সকাল থেকেই তো আকাশটা কেমন মেঘলা করে আছে। এই বাদলায় এরপর কি আর কেউ আসবে?" তোতনের কথা শেষ না হতেই আলোর ঝলকানি, কড়াৎ করে বিদ্যুতের শব্দ। হাওয়ায় দরজা জানলা তোলপাড়। জানালা বন্ধ করতে করতে মিলন বলে, "না। না। আর অপেক্ষা করে কাজ নেই।"

পরপর তিনজন গল্প পাঠ করার পর, চতুর্থ জন উঠে দাঁড়াতেই কলিংবেলের শব্দ। এবার আমি উঠে গিয়ে ছিটকিনি খুলে আস্তে আস্তে দু-হাতে দরজাদুটো একটু ফাঁক করে ধরতেই হু হু করে ঠান্ডা হাওয়া, আর সেই হাওয়ায় উড়ে আসার মত করে ঘরের মধ্যে যার প্রবেশ ঘটল তাকে দেখে আমাদের দশজনের চোখ ছানাবড়া। তালগাছের মত ঢেঙা লোকটার গায়ের রঙ ফ্যাকাসে সাদা। মাথায় একবোঝা উস্কোখুসস্কো ভেজা চুল, গালে কপালে বৃষ্টির জলের ছিটে। ওকে আমাদের পুরোনো বন্ধু বাবুরাম বলে প্রথমে আমরা কেউই চিনতে পারিনি।

"কীরে? অমন আলুভাতের মত মুখ করে চেয়ে আছিস কেন সব? চিনতে পারছিস না?" বলতে বলতে ধপাস করে মেঝের ওপর বসে পড়ে—পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ-মুখ মুছতে লাগল সে।

বাবুরাম এই শহর থেকে প্রায় পাঁচবছর আগে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। তারপর ওর আর কোনও খবর পাওয়া যায়নি। ওকে নিয়ে কোন গুজবও রটেনি এতদিন। কারণ, নিরুদ্দেশ হওয়ার কারণটা ও খুব স্পষ্ট করেই লিখে রেখে গিয়েছিল। বারো বছর বয়সেই যার জীবনের ওপর বিতৃষ্ণা ধরে যায়, তাকে কী আর সংসারে ধরে রাখা যায়? আট বছর বয়সে ভয়ঙ্কর এক নৌকোডুবিতে মা, বাবা দুজনকে একসঙ্গেই হারিয়েছিল বাবুরাম। মামা মামি বুক দিয়ে আগলেছিলেন। কোনও দিন কারও কাছ থেকে অনাদর অবহেলা পাওয়া তো দূরের কথা, শান্ত শিষ্ট স্বভাবের জন্য পাড়াপড়শি আত্মীয়স্বজন সবাই ওকে খুবই ভালবাসত। পড়াশোনায়ও বেশ ভালই ছিল। কিন্তু কিছুতেই ওর মন ভরেনি। সেই দুর্ঘটনায় প্রাণে বেঁচে গেলেও, মানসিক ভারসাম্য একটু টাল খেয়েছিল। ক্লাস এইটে উঠেই একদিন রাতে বাড়ি ছাড়ল বাবুরাম। হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করে মনের শান্তি ফিরিয়ে আনাই নাকি ওর উদ্দেশ্য। মামা মামিকে চিঠিতে সে কথাই জানিয়ে দিয়েছিল। সেই চিঠি আমরা অনেকেই পড়েছি। প্রথম প্রথম বাবুরামের জন্য খুব মনখারাপ হয়েছে। তারপর, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ওর স্মৃতি-ঝাপসা হতে হতে একদিন মুছেই গিয়েছিল। এতদিন পর সেই বাবুরাম সুস্থ সবল শরীরে আমাদের সামনে উপস্থিত। কিন্তু—

গা ছম ছম করা এই আষাঢ় সন্ধ্যায় নিরুদ্দেশ বন্ধুর হঠাৎ আবির্ভাবে আমাদের মনে আনন্দের বদলে কী যেন এক অস্বস্তি। কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর হৈ হৈ করে উঠলাম, 'ও মা, বাবুরাম তুই? এতদিন কোথায় ছিলি, কেমন ছিলি? কী করছিলি? কবে এলি? আমরা তো কোনও খবরই পাইনি।'

"তোদের চমকে দেব বলেই তো হঠাৎ এলাম। আগে খবর দিয়ে এলে কি সবাই এমন ভূত দেখার মত আঁতকে উঠতিস?"

'দূর, ভূত দেখা বলছিস কেন? মেঝেতে নয়, নে, এই চেয়ারে বোস' পাশের চেয়ারটা একটু দূরে ঠেলে দেয় তোতন। চেয়ারটা তোতনের কাছে টেনে নিয়ে গুছিয়ে বসে বাবুরাম।

অতিথিদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার নাম যেন কী ভাই?"

"বাবুলাল।"

'সে কিরে, তোর নাম তো বাবুরাম।'

'ওই একই হল।' বাবুরাম মিটিমিটি হাসছে। তবে কি রাম নাম উচ্চারণে ওর কোনও অসুবিধে আছে? আমার গাটা শিউরে উঠছে।

ইতিমধ্যে ভেতরে গিয়ে এক গামলা মুড়ি ও একথালা তেলেভাজা নিয়ে এল রাজু। মুড়ি তেলেভাজা সহযোগে ভুতের গল্প বেশ জমে উঠল।

সবশেষে আমরা বাবুরামকে ধরে বসি। 'এবার তোর গল্প বল।'

'আমার গল্প না ভূতের গল্প?'

'ওই একই হল।' পাশ থেকে কে যেন ফোড়ন কাটল। কথাটা বোধহয় বাবুরামের কানে যায়নি।

'শোন তবে—হিমালয়ের উদ্দেশ্যে বাড়ি, মানে মামাবাড়ি ছেড়েছিলাম। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে যে গাড়িটা প্রায় ছাড়বে ছাড়বে করছে, সেটাতেই প্রায় লাফিয়ে উঠে পড়লাম। ট্রেনটা ছিল চেন্নাই মেল। উত্তরের বদলে পৌঁছলাম দক্ষিণে। সেই চেন্নাই শহরে। নানা দেশ ঘুরে, নানা ঘাটের জল খেয়ে ভাসতে ভাসতে একদিন দেখি আমি খড়্গপুর শহরে। এই পাঁচটা বছর কোথায় কীভাবে দিন কেটেছে সে কাহিনি এখানে অবান্তর।

খড়্গপুরে আমি একজন ভদ্রলোকের বাগানের মালি। সারাদিন সবজি ও ফলের বাগানে হাড়ভাঙা খাটুনির পর রাতে মালিকের চোখরাঙানি আর ধমক খেতে খেতে একদিন আমার বিবেক দংশন শুরু হল। হিমালয়ে তপস্যা করার উদ্দেশ্যে বাড়ি ছেড়ে এখন এ আমি কী করছি? মামা-মামির জন্য, বন্ধু বান্ধবের জন্য মন উচাটন হয়ে উঠল। মালিককে সেকথা বলে ছুটি চাইলাম। তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না।

সেদিন ছিল রবিবার। খাওয়া দাওয়া সারতে সারতে বেলা গড়িয়ে গেল। ঝোলা ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে জোর করেই বেরিয়ে পড়লাম। আমার নতুন কেনা সুটকেসটা ওখানেই পড়ে রইল। তার সঙ্গে রইল আমার চাকরি।

স্টেশানে এসে দেখি, হাওড়ার ট্রেন ছাড়তে দেরী আছে। প্লাটফর্মের একটা খালি বেঞ্চে মাথার তলায় ব্যাগ রেখে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লাম।

অনেক রাতে ঘুম ঘুম চোখ মেলে দেখি, একটা ট্রেন ছাড়ছে। হাওড়ার দিকেই তার ইঞ্জিনের মুখ। সামনে যে কামরা পেলাম চোখমুখ বুজে তাতেই উঠে পড়লাম। ট্রেনও ছেড়ে দিল। থ্রি টীয়ার রিজার্ভ কোচ। সবচেয়ে ওপরের বার্থে উঠে শুয়ে পড়ি। ব্যাগটা মাথার তলায়ই রয়েছে। আবার ঘুম।

খিদের জ্বালায় ঘুম ভেঙে গেল। তখন গভীর রাত। চেয়ে দেখি চারপাশে জনমনিষ্যি নেই। যখন উঠেছি, বেশ ফাঁকা হলেও, দু-চারজন যাত্রী বোধহয় ছিলেন। তাঁরা সবাই হয়তো তাঁদের গন্তব্যস্থলে নেমে গেছেন। কিন্তু তার বদলে একজনও ওঠেনি। ব্যাপারটা অদ্ভুত, তবে অসম্ভব নয়। ভাবতে ভাবতে একটা স্টেশন এসে গেল। বেশ বড় স্টেশান। এই রাত দুপুরেও জানালায় 'ইডলি ধোসা' হেঁকে যাচ্ছে। গরম চা। গব গব করে চারখানা ইডলি গিলে ফেলে, সবে চায়ে চুমুক দিয়েছি, ট্রেন ছেড়ে দিল। ওপরে উঠতে গিয়ে দেখি আমার উল্টো দিকের সবচেয়ে নিচের বার্থে আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন একজন। নিচে নামার সময় তো সিটটা খালিই দেখেছি। ইতিমধ্যে কাউকে উঠতেও দেখিনি। কী জানি, হয়তো খেয়াল করিনি।

সন্ধ্যে থেকে একটানা ঘুমিয়েছি, ফলে ঘুম আর আসতে চাইছে না। চোখ বুজে পড়ে আছি। হঠাৎ তলা থেকে খসখস শব্দ, তাকিয়ে দেখি নিচের বার্থের মানুষটি উঠে বসেছেন। তাঁর পরনে ধপধপে সাদা থান, চোখমুখ সব ঘোমটায় ঢাকা। একজন মহিলা। মাঝের বার্থে কেউ কেউ নেই বলে সোজা হয়ে বসতে তাঁর কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।

হঠাৎ হাসির শব্দ। সমবেত কণ্ঠে। প্রথমে খিলখিল, তারপর হি হি, হো হো, হা হা। হাড় হিম করা শব্দ। সারা শরীর শিউরে উঠল। কানে আঙুল দিয়ে মনে মনে ঠাকুরের নাম জপ করতে লাগলাম।

'কী ঠাকুর বাবুদা? কী নাম জপ করলে?' তোতনের ছোটভাই বাবন জানতে চায়।

'জগন্নাথ।' স্থির গলায় জানিয়ে দেয় বাবুরাম।

'তারপর?'

'তারপর সব চুপচাপ। মিনিট দশেক একেবারে নিস্তব্ধ। যাকে বলে পিন ড্রপ সাইলেন্স। এবার খট খট খট খট। চোখ বুজেই বুঝতে পারছি একদল লোক সারা কামরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের পায়ে কাঠের জুতো। খড়মজাতীয়। নাকি সুরে সেই মহিলার ডাক—

'খুঁকি, ওঁ খুঁকি, শুনছিস?'

'কী বলঁছো বঁলো না। চিঁল্লাচ্ছ কেন?'

'ওপরের খোঁকাটা ঘুঁমিয়ে পঁড়ল?'

'নাঁ।'

কী আশ্চর্য! আমি যে ঘুমোইনি ভুতের খুকিটা কী করে বুঝতে পারল?

ভয়ে ভয়ে চোখ খুলতেই দেখি, জোৎস্নায় চারদিক ভেসে যাচ্ছে। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় মহিলার ঘোমটাটা খসে পড়ল।

ওঃ সে কী বীভৎস দৃশ্য। মহিলাটি সাধারণ মহিলা নন, সাদা থানে জড়ানো একটি কংকাল। তিনি মিটি মিটি হাসছেন। তাঁর দাঁতের সারি চাঁদের আলোয় মুক্তোর মতই ঝলমল করছে। আসে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে একদল খোকা, খুকু, মানে নানা বয়সের নানা সাইজের কংকাল। আমার সারা শরীর ঠান্ডা হয়ে আসছে। হাতে পায়ে কোনও সাড় নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই বোধহয় ওদের দলেই ভিড়তে হবে। কিন্তু তা হলে তো চলবে না। আমি চলেছি মামামামির কাছে ক্ষমা চাইতে। আরও অনেক কাল বেঁচে থেকে তাঁদের সেবাযত্ন করে কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করতে। এই পাঁচটা বছর আমার জন্য কম কষ্ট তো তাঁরা পাননি। আবার চোখ বুজে শক্ত হয়ে শুয়ে রইলাম। তাতেও কি রেহাই আছে?

এবার শুরু হয়ে গেল নাচ। চোখ পিট পিট করতে করতে তাকিয়ে রইলাম। 'গুপি গাইন বাঘা বাইনে'র মত সেই ছন্দে ছন্দে আনন্দের নাচ নয়। এটা সত্যিকার ভূতের নৃত্য। যেখানে সেখানে পা ফেলে লম্ফ ঝম্ফ দিয়ে, দুহাত তুলে, মুখ ভেংচে সে এক দক্ষযজ্ঞ কান্ড।

কিছুক্ষণ পর সব চুপচাপ। হঠাৎ দেখি মহিলার সামনে মস্ত এক হাঁড়ি, ঢাকনা দেওয়া। ছানাপোনারা নাচ থামিয়ে, তার চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে। 'মাঁ। কুঁড়কুঁড়ে খাঁবো, চিঁপস খাঁবো।' বায়না ধরল কেউ।

'খাঁ, খাঁ। কঁত খাঁবি খাঁ।' হাঁড়ির ঢাকনা খুলে দিলেন মহিলা। কীসব যেন তুলছে আর মুখে পুরছে। কিন্তু গিলছে না। গিলবে কী করে? ওদের যে গলা, পেট কিছু নেই। হাত চলছে খটাখট। মুখ চলছে ফটাফট, দাঁতে দাঁতে ঘষাঘষি। কিন্তু খাবারগুলো কী? আর সেগুলো যাচ্ছেই বা কোথায়?

দাঁতের পাটি লেগে আসছে। তবে কি আমি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি? কিন্তু জ্ঞান হারালে যে আমার কৌতুহল মিটবে না। মানুষের কৌতুহল যে কী শক্তিশালী প্রবৃত্তি, সেদিনই বুঝলাম। কৌতুহলের নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত আমার তো জ্ঞান হারানো চলবে না, এমনকি মরাও নয়।' এই প্রতিজ্ঞায় জোর করেই বেঁচে রইলাম। এখনও আছি।'

'এখনও আছিস তো?' মনে মনে বলি।

'একদৃষ্টে একাগ্রমনে চেয়ে আছি। চোখ ছাড়া আমার শরীরে আর কোন ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্বই নেই। ব্যাংয়ের ঠ্যাং, গিরগিটি, আরশোলা উচ্চিংড়ে, মুচমুচে করে ভাজা। কয়েকটা গুবরে পোকাও যেন দেখলাম। আলুভাজা মানে পটেটো চিপ্‌সের মত কুড়মুড় কুড়মুড় করে চিবিয়ে খাচ্ছে ওরা। একমুঠো জোঁক আর কেঁচোভাজা ওদের হাতে তুলে দিতে দিতে মা বললেন, 'এঁই নেঁ। কুঁড় কুঁড়ে আঁর ঝুঁরিভাজা।' অবাক হয়ে দেখি, ওই নরম নরম প্রাণীগুলোকেও কেমন মুচমুচে করে ভাজা হয়েছে। ওইসব বস্তুগুলো দাঁতে পিষে ধুলোর মত হয়ে যাচ্ছে, তারপর মেরুদন্ডের হাড় বেয়ে নিচে নামতে নামতে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। পেট না ভরলেও খাওয়ার আনন্দেই মশগুল হয়ে আছে ওরা। জিভ টিভ কিছু নেই। ওদের টেস্ট বাড বা স্বাদগ্রন্থিগুলো বোধহয় দাঁতের মধ্যেই থাকে। তা নইলে খেতে খেতে এমন দাঁত খিঁচুনিই বা দেবে কেন? ভোজের সেই ভৌতিক আনন্দ উপভোগ করতে করতে তৃপ্তিতে আমার মন ভরে গেল। কখন যেন গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতে দেখি, বিরাট এক প্লাটফর্ম। একটা বেঞ্চে আমি শুয়ে আছি। মাথার তলায় আমার সেই কাপড়ের ব্যাগ। কোথায় গেল সেই রাতের ট্রেন, ভূতের নাচ আর তাদের খানাপিনা? তবে কি আমি বেঁচে নেই?

নিজে জীবিত না মৃত যে বুঝতে পারছে না তার অবস্থাটা একবার কল্পনা কর। দুহাতে মুখ ঢেকে মামা গো বলে ফুঁপিয়ে উঠলাম। এদিক সেদিক থেকে কয়েকজন ছুটে এল। তাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে গিয়েই চোখে পড়ল স্টেশনের নাম লেখা বোর্ড 'খড়্গপুর'। বুকের ওপর থেকে মস্তবড় একটা বোঝা নেমে গেল। কাল সন্ধ্যে থেকে আজ সকাল পর্যন্ত তবে আমি সেই একই জায়গায় রয়েছি—গলা ছেড়ে গেয়ে উঠলাম—

'রঘুপতি রাঘব রাজারাম—পতিতপাবন সীতারাম
সীতারাম জয় সীতা রাম।।'

'এ কি বাবুদা তুমি তো দিব্যি রামনাম উচ্চারণ করছো। তবে তখন নাম জিজ্ঞাসা করায় বাবুলাল বললে কেন?' বাবনের প্রশ্ন।

এই ভুতুড়ে সন্ধ্যায় সত্যিকার ভূত দেখার রোমাঞ্চটা তোদের উপভোগ করানোর লোভটা সামলাতে পারিনি, তাই—'

ছবি: ওয়াসিম হেলাল

জোড়া-মৃত্যু রহস্য

অনির্বাণ বসু

"ভূত দেখেছিস কখনো?"

সীরিয়াস টোনে অনীশের এই হঠাৎ প্রশ্ন আমাদের এই সান্ধ্য আড্ডার হালকা মেজাজকে যেন এক ধাক্কায় পাল্টে দিয়ে সম্পূর্ণ অন্য রকম চেহারা দিয়ে দিলো।

অফিসের কাজের চাপ সামাল দিতে দিতে একেবারে নাজেহাল হয়ে, অবশেষে হঠাৎ-ই কোনো রকম প্ল্যান প্রোগ্রাম না করে, বিনা নোটিশে আমি আমার ছোট বেলার বন্ধু অনীশ-এর ব্যারাকপুরের বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিলাম গতকাল সকালে। অফিস থেকে যাকে বলে এক্কেবারে ডুব, তাই। এরকম বেমক্কা চলে আসাতে অনীশ তো ভীষণ খুশী হয়েছিলো-ই আবার দস্তুর মতো চটে-ও গিয়েছিলো।

"তুই একটা চিরকালের বাউন্ডুলে বোহেমিয়ান ইডিয়ট," দরজা খুলে দিয়েই আমার হ্যাভারস্যাকটাকে দেখে মন্তব্য করেছিলো অনীশ। "এখানেই আড্ডা গাড়বি, নাকি এটা তোর স্টপ ওভার-এন রুট টু মাউন্ট কৈলাশ?"

আমার একটু ট্রেকিং করার অভ্যেস আছে। গত বছর মুক্তিনাথ ট্রিপ করে ফিরেছি। অনীশ অবশ্য যায়নি। "নো স্যার," হেসে বললাম আমি, "উপস্থিত আমি তোমার স্কন্ধে অবস্থান করবো ফর দ্য নেক্স্ট ফাইভ ডেজ।"

"তুই তো আচ্ছা যাকে বলে একটা ইয়ে রে!" অনীশ হাঁই মাঁই আরম্ভ করে দিলো। "তোর কি একটা কোনো আক্কেল নেই? অবশ্য", একটু চুপ করে থেকে বললো সে, "কোনো কালে-ই তোর ছিলো না। একবার তুই যদি বলতিস, আমি স্টেশনে যেতাম তোকে আনতে। আর তোর কি রে সেন্সটা? আর পাঁচ মিনিট দেরী করলেই আমি অফিস বেরিয়ে যেতাম। আমার ফ্ল্যাট বন্ধ হয়ে থাকতো আন্ডার লক অ্যান্ড কি। আমি বেরোলে আমার চাকর উদয়-ও বেরিয়ে যায় পার্ট টাইম চাকরী করতে। করতিস টা কি তখন শুনি?"

"কেন?" আমি মিষ্টি হেসে বললাম। "ওই তো তোর বাড়ির উল্টোদিকে 'মাসীমা'র বিরিয়ানি'। ওখানে তোর অ্যাকাউন্টে খেতাম। ওরা তো তোকে চেনে তুই বলেছিলি। আর তার পাশেই তো 'জয়কৃষ্ণ মিষ্টান্ন ভান্ডার'। তাদের হালুয়া নাকি কলকাতার তাবড় তাবড় হোটেলে যায়। সেখানেও খেতাম। সবাই তো তোকে এখানে চেনে, তাই না?"

অনীশ বরাবর-ই একটু যাকে বলে সেফ সাইডে থাকার ছেলে। পড়াশোনা করে, ইতিহাস-এ রীতিমতো ইন্টারেস্ট আছে। আমার ঠিক উল্টো। ওদের বহু পুরুষ ধরে ব্যারাকপুরে বসবাস, বৃটিশ আমলের পত্তনের আগে। যদ্দুর জানি ওদের কাঠের পৈতৃক ব্যবসা ছিলো। অনীশের আবার এসব ধাতে সয় না। সে ব্যবসায় কাগজ পত্তর-এর মধ্যে একদম থাকতে চায় না। নিজের পৈতৃক বাড়ির কিছুটা ভেঙে দিয়ে, একটা ছ'তলা মাল্টিস্টোরি

তুলে তারি মধ্যে একটা ফ্ল্যাট-এ সে নিজের অফিস আর বই-টই নিয়ে দিব্যি আছে। তার জমির কিছুটা অংশে একটা পোড়ো জমি আছে, যাতে কিছুটা অংশে বাগান আর একটা পুকুর আছে।

"সেটাও যদি তোর গায়ে লাগে," বলে চললাম আমি, "তাহলে তোর প্রাসাদতুল্য ফ্ল্যাটের পাশে যে পুকুরটা আছে, তার-ই মাছ তুলে ধরে ভেজে খেতাম।"

এই উত্তর শুনে অনীশ কিছুক্ষণ আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইলো। তারপর আমার পিঠে একটা থাবড়া মেরে এক গাল হেসে বললো, "আয়, আয় ভেতরে আয়। আমাকে আগে বললে আমি আফিসের ছুটি নিতাম। এখন তো আমাকে অফিসে ঢুঁ মারতেই হবে। তারপর তোর খাওয়া দাওয়া....."

"আরে কুছ পরোয়া নেহী। তুই ভুলে যাচ্ছিস আমি ও তোর মতোই অকৃতদার। আমার অভ্যেস আছে নিজে রান্না বান্না করার স্যার!"

দিনটা খেয়ে গড়িয়ে বেশ ভালভাবেই কাটলো। আমার অনারে অনীশ অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে। আমার প্ল্যান ছিলো স্রেফ ঘুমোনো আর আড্ডা মারা সন্ধ্যে থেকে রাত অবধি। মাস পাঁচেক ধরে অফিসে কন্সট্যান্ট কাজের প্রেশার গেছে।

ব্যারাকপুর স্বাস্থ্যকর জায়গা কিনা আমার জানা নেই, কিন্তু স্রেফ একদিনে আমার যে রীতিমতো ফ্রেশ লাগছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আসলে একটা জল-আবহাওয়া আর ডেইলি রুটিনে-র চেনজ হলে অনেক রিল্যাকসড আর চাঙ্গা লাগে, এবং আমি খুব বিশ্বাস করি যে এটা প্রত্যেকে-র জীবনে খুব দরকার। তবে কলকাতার জলের পরে যে কোনো জায়গার জল যে শরীরের পক্ষে ভালো তা আর স্বীকার না করে উপায় নেই।

পরেরদিন সন্ধ্যেবেলা, আমি আর অনীশ ওদের ছ'তলার ছাদের ওপর দুটো ডেকচেয়ার নিয়ে বসলাম। মে মাস, গরম বেশ ভালোই, কিন্তু ছ'তলার ছাদে, গঙ্গার ফুরেফুরে হাওয়ায় মনপ্রাণ যেন একেবারে জুড়িয়ে গেলো। তারপর অনীশের সঙ্গে পুরোনো দিনের কথা মন কে একেবারে তাজা করে দিলো। উদয় মাঝে মধ্যে উদয় হয়ে চা, শরবৎ সার্ভ করে যাচ্ছে। পুরোনো দিনের কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমি বলে উঠলাম, "হস্টেলে সুবীরকে ভূত দেখানোর কথা মনে আছে তোর? আমরা সব চাঁদা করে মুখোশ কিনলাম। বর্ষার রাত্তিরে আমি দাঁড়ালাম মুখোশ পরে আবছা আলোয়, প্ল্যান ছিলো ও বাথরুম থেকে বেরোলেই, মুখোশ পরা অবস্থায় দাঁত খেঁচাবো।"

"আমাদের বাথরুমটা তো ছিলো মেন বিল্ডিং থেকে একটু দূরে," মুচকি হেসে বললো অনীশ, "লাগোয়া নয়।" "আরে সেখানেই তো হয় গেলো গন্ডগোল," আমি বলে উঠলাম। "বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আমি ভিজলাম, আর যেই ব্যাটা বেরোলো বাথরুম থেকে, অমনি আমার-ই এক হাঁচিতে সব পন্ড!"

অনীশ একটু হাসলো বটে, কিন্তু তার পরেই কিরকম গম্ভীর হয়ে আমাকে প্রশ্নটা করলো যার কথা আমি গোড়াতেই বলেছি। ও'র কথা বলার মধ্যে একটা সীরিয়াস ভাব ছিলো যার জন্য বাধ্য হয়ে-ই আমি তাকালাম ও'র দিকে। ছাতটা অন্ধকার হলেও, আশে পাশের ফ্ল্যাট থেকে ছিটেফোঁটা আলো এসে অনীশের ওপর পড়েছে। তাতে দেখলাম তার চোখে মুখে যেন এক অদ্ভুত উত্তেজনা। কি বলতে যাচ্ছিলো সে, কিন্তু ইশারায় বারণ করলাম আমি। একটা ছায়ামূর্তি। ধীর পদক্ষেপে যেন এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। সেকেন্ড খানেক পরে নিজের ভুলে হেসে ফেললাম আমি। ছায়ামূর্তি নয় উদয়। আসলে অন্ধকারে ভূতের উল্লেখ করলেই কিরকম চারিদিকের পরিবেশটা একটা ভৌতিক চেহারা নয়। অনীশের ফ্ল্যাটের ছাতে অবশ্য গাড়ি ঘোড়ার আওয়াজ কম, যদিও ও'র ফ্ল্যাট-টা বেশ জমজমাট জায়গায়। উদয় নিঃশব্দে এসে দুটো গেলাসে আম পোড়ার শরবৎ রেখে আমাদের এঁটো বাসন গুলো তুলে নিয়ে আবার নিঃশব্দে চলে গেলো। একটু চুপ করে থেকে শরবৎ-টা তে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলো অনীশ, "জানিস তো কলকাতা-তেও যেমন সাহেব ভূত আছে, ব্যারাকপুর-এও আছে?"

আমি নিঃশব্দে শরবৎ-টাতে চুমুক দিলাম। বেড়ে করেছে আমপোড়ার শরবৎ-টাকে উদয়, একেবারে মন প্রাণ যেন জুড়িয়ে যায়। কিন্তু যেহেতু ভূতের ব্যাপার উল্লেখ হয়েছে, তাই মন প্রাণ জুড়োলো না, একটা সাময়িক উত্তেজনা তে হয়ে রইলো ভরপুর।

"কলকাতা শহরে সাহেব ভূত আছে জানিস তো?" অনীশ আবার প্রশ্ন করলো।

"জানি," একটু চুপ করে থেকে বললাম আমি। "আলিপুর অঞ্চলে, জাজেস কোর্ট রোডে, ১৭৭৬ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর তৈরী বাড়িটায় নাকি ভুত আছে। অন্ততঃ লোকে তাই বলে। এখনো এই একবিংশ শতাব্দী-তে, রাত্তির বারোটার সময় ঘোড়ার

টানা গাড়ির আওয়াজ শোনা যায়, এমনকি এও শোনা যায় ওর আরদালী-রা ওনাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। কিন্তু আমি কোনোদিন শুনিনি, কারণ রাত্তিরে ওই বাড়ি-র চারপাশে যাবার সৌভাগ্য আমার হয়নি, যদিও ও ব্যাপারে আমার কিঞ্চিৎ ইন্টারেস্ট আছে।"

"হুম," গম্ভীর ভাবে বলে উঠলো অনীশ," জানিস দেখছি।"

আমি চুপ করে রইলাম। দূর থেকে একটা ট্রেণের হুইসল ভেসে এলো আমার কানে। অনীশের ফ্ল্যাট স্টেশনের খুব কাছে না হলেও এখান থেকে ট্রেণের আওয়াজ পাওয়া যায়। আমি আগেও পেয়েছি। রাত বাড়লে এ আওয়াজ যেন আরো বেড়ে যায়, তার একটা কারণ বোধহয় যে চারিদিকের আওয়াজ ক্রমশ: কমে আসে।

"এখানেও সাহেব ভূত আছে," আস্তে আস্তে বলে উঠলো অনীশ।

"কোথায়?" অনীশের বাবার আমলের একটা ডেক চেয়ারে আধ-শোয়া হয়ে শুয়েছিলাম আমি, ও'র কথায় নড়ে চড়ে উঠে বসলাম। ভারী আরামের এই জাহাজের ডেক-এর চেয়ার। এখন বসা তো দূরের কথা, দেখতে-ই পাওয়া যায় না। "এখানে, মানে ঠিক শহরের এদিকটায় নয়, অন্যদিকটায়, ক্যানটনমেন্ট এরিয়াটায়," বলে চললো অনীশ। "যদি চাস তো কাল একবার দেখতে যাওয়া যাবে স্পট টা।"

"আমার আপত্তি নেই," শরবৎ-এর গেলাশ তুলে নিয়ে জবাব দিলাম আমি। "তোকে দেখতে এসে যদি তোর এক জাতভাই-এর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তাহলে মন্দ কি?"

"তুই ব্যারাকপুর সম্বন্ধে কি জানিস?" আমার ঠাট্টা-টা কে গায়ে না মেখে, একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলো অনীশ। খেয়াল করলাম তার শরবৎ খাওয়া শেষ।

"এক মঙ্গল পান্ডের ব্যাপারটা ছাড়া জানার কিছু আছে নাকি?" আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম।

"২৯ মার্চ ১৮৫৭ সালে মঙ্গল পান্ডে এক সাহেব কে গুলি করে মেরে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন তৎ কালীন যুগের পরম পরাক্রমী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো অনীশ। "তারপর কোর্ট-মার্শাল, তারপর ৮-ই এপ্রিল তাঁর ফাঁসি এই ব্যারাকপুরে-ই।"

"তুই কি তাঁর.....?"

আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলে চললো অনীশ, "কিন্তু আমি তাঁর কথা বলছি না।" তারপর আমার দিকে সটান তাকিয়ে বললো সে, "১৭৭২ কোমপানীর ফৌজি ব্যারাক স্থাপিত হয় এখানে। সেই থেকে এই নাম। তার আগে ব্যারাকপুরের নাম ছিলো।"

আমার দিকে নিজের ডেক চেয়ারটা একটু টেনে নিয়ে ঝুঁকে পড়ে বললো অনীশ—"কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা যাঁকে বলা হয় সেই জোব চার্ণক—তাঁর সঙ্গে এ নামের কোনো সম্বন্ধ নেই—যদিও তিনি আদৌ কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা কিনা তা নিয়ে অনেক মতভেদ আছে, কারণ অনেকে মনে করেন যে আর্মেনিয়ান-রাই হচ্ছেন কলকাতার আসল প্রতিষ্ঠাতা। মোটের ওপর, চানক কথাটা-র দুটো তাৎ পর্য হতে পারে, এক এটা এসেছে মৌর্য বংশের চন্দ্রগুপ্তের চতুর মন্ত্রী চাণক্য-এর কাছ থেকে, অথবা চানা থেকে।"

"চানা? মানে ছোলা?" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম। "সেতো ঘোড়ার খাদ্য রে!"

মনে পড়ে গেলো, সেদিন সকালবেলা গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে গিয়ে দেখি দুটো টাট্টু ঘোড়া-র মুখে দুটো বস্তা বাঁধা, মুখ নীচু করে লক্ষী ছেলের মতো ব্রেকফাস্ট সারছে।

"কেন, শুধু ঘোড়া কেন? মানুষের নয়? কালই তো ছোলার ডাল, লম্বা বেগুন ভাজা, দরবেশ আর লুচি দিয়ে ডিনার সারলি।"

"যাকগে বলে যা।"

"১৭৭২-এ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়নি, ইস্ট ইন্ডিয়া কোমপানী-ই হর্তা কর্তা বিধাতা। নিজেদের সেফটি-র জন্য এবং ব্যবসা বৃদ্ধি-র জন্য তারা ফৌজ রাখতো। তাদের গভর্ণর জেনারেল কে লাট বাহাদুর বলতো, তা জানিস বোধহয়।"

"আরে হ্যাঁ রে বাবা।" আমি শরবৎ খাওয়া শেষ করে গেলাশ-টা নামিয়ে রাখলাম।

"তাঁরা প্রায়-ই উইকএণ্ড কাটাতে বেড়াতে আসতেন এখানে," বলে চললো অনীশ। "মোটামুটি ১৭৭২ সাল থেকেই ব্যারাকপুর গড়ে ওঠে কোমপানীর গুড উইকেন্ড স্পট হিসেবে, লাট বাহাদুরদের বাগানবাড়ি। তারপরে লর্ড ওয়েলেসলি তো চিড়িয়াখানা পর্যন্ত তৈরি করিয়েছিলেন ব্যারাকপুরে, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেটা টিকলো না।" অনীশ একটু থামলো। আমি কিন্তু এখনো বুঝতে পারছি না যে এর সঙ্গে অনীশের ভূতের উল্লেখ-এর কি সম্পর্ক থাকতে পারে। রাত বাড়ছে। চারিদিক কিরকম চুপচাপ হয়ে

আসছে। একটা সাইকেল রিক্সা ঠুনঠুন করতে করতে চলে গেলো-খুব আস্তে তার আওয়াজ পেলাম-যেন বহুদূর থেকে আসছে সেটা।

"তুই হয়তো ভাবছিস যে এ সবের সঙ্গে সাহেব ভূতের কি সম্পর্ক থাকতে পারে, কিন্তু তোকে এই ইন্ট্রোডাকশনটা দিলাম যাতে তোর একটা মোটামুটি আইডিয়া হয় যে তখনকালের দিনকাল এখানেই কিরকম ছিলো," অনীশের গলা আবার ভেসে এলো। "সে এক এলাহি ব্যাপার, কারণ বড়লাট বেড়াতে এসেছেন, আর তাঁর সঙ্গে তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গ, সিপাই-লস্কর, লটবহর সব চলেছে, অনেকটা আগেকার দিনের রাজারা যেমন তাঁদের পাত্র-মিত্র সভাসদগণ নিয়ে মৃগয়া যেতেন, সেরকম। মোটামুটি একটা চলমান রাজপ্রাসাদ আর কি। এঁদের সঙ্গে অনেক হোমরা-চোমরা, মন্ত্রী-আমলাও যেতেন এবং এদের মধ্যে সবাই যে খুব ভালো ছিলেন তা নয়, অনেক বদমেজাজি সাহেবও ছিলেন যেমন উইলিয়াম টেগার্ট।"

"কে তিনি?" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"ইতিহাসের পাতায় এনার নাম গন্ধও নেই," একটু চুপ করে থেকে বললো অনীশ। "কিন্তু লোকমুখে শোনা যায় যে এনার মতো অত্যাচারী এবং বদমেজাজি নীলকুঠির সাহেব নাকি আর দুটি পাওয়া যেতো না। কথায় কথায় ইনি এদেশের লোকেদের ওপর নির্দ্বিধায় অত্যাচার করতেন, এবং সামান্য কারণে তাদের প্রাণ নাশ করতে একদম পেছপা হতেন না। অত্যন্ত রহস্যজনক ভাবে তাঁর মৃত্যু হয় এই ব্যারাকপুরেই এবং যেখানে তাঁর মৃত্যু হয় সে বাড়িটা এখন এক পোড়ো বাড়ি, যদিও সে সময় ছিলো সেটা ছিলো যাকে বলে আস্তাবল। লোকমুখে শোনা যায় যে তাঁর ভূত নাকি এখনো সে বাড়িটায় হানা দেয়, কারণ তা ছিলো অপঘাতে মৃত্যু।"

"কি ভাবে হয়?"

"জানিনা," মাথা নেড়ে বললো অনীশ। "তবে সে বাড়িটার কিছুটা অংশ এখনো আছে। এদিকে নয় ক্যানটনমেন্ট এরিয়াতে, মানে এখন যেখানে ইন্ডিয়ান আর্মির ঘাঁটি। পারতপক্ষে কেউ ওদিকটা মাড়ায় নয়। আমি বিস্তর বইপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করেছি, কিন্তু উইলিয়াম টেগার্ট-এর মৃত্যুর রহস্যের কোনো কিনারা করতে পারিনি। কোনো সঙ্গীও পাইনি যার সঙ্গে ও বাড়িতে রাত কাটানো যায়। রাত কাটালে হয়তো এ রহস্যের উদঘাটন করা যেতো। তাই ভাবছিলাম, তুই যখন এসেইছিস, তাহলে....."

কথা না বাড়িয়ে আমরা ঠিক করি যে পরদিনই আমরা ওখানে রাত কাটাবো। আমার অ্যাডভেনচার-এর নেশা আছে, পাহাড়ে ট্রেকিং করেছি অনেক, অনেক রকম বিচিত্র অভিজ্ঞতাও হয়েছে, কিন্তু কোনোদিন ইয়েতি বা অ্যাবোনিমেবল স্নোম্যান বা তিব্বতি ভাষায় যাকে বলে মিগোউ-এর দর্শন পাইনি। অবশ্য সেটা পেলে যে খুব সুখকর হবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই, কারণ তিনি খুব সজ্জন ব্যাক্তিবিশেষ কিনা সেটা হলপ করে কেউ বলতে পারে না। কিন্তু বাড়ির কাছে এই ব্যারাকপুরে বসেই যদি দুশো বছরের এক সাহেব ভূত এর দেখা মেলে, তা আর মন্দ কি? "আমাদের বাড়ির চারপাশটা একবার আগে থেকে দেখে নেওয়া দরকার," আমি বললাম। "ভুত দেখতে গিয়ে আমি পোকা-মাকড়, সাপ-খোপের কামড় খেয়ে একটা কান্ড বাধাতে আমি মোটেই রাজি নই।"

"বেশ তো," বললো অনীশ। "কাল আমার ছুটি। কাল বিকেলেই সার্ভে করে নিয়ে, কাল রাত্তির-এই না হয় আমাদের নৈশ অভিযানে বেরোনো যাবে।"

অনীশের মুখে বাড়িটার সম্বন্ধে শুনে আমার যে রকম ধারণা হয়েছিলো, চাক্ষুষ দেখে মনে হলো বাড়িটা যেন আরো পুরোনো। এককালে বিরাট একটা স্ট্রাকচার ছিলো নিশ্চয়ই কিন্তু এখন শুধু তার ওয়ান টেনথ অবশিষ্ট আছে। অবশ্য সেখানে কতখানি নিরাপদ ভাবে রাত কাটানো যেতে পারে তা একটা প্রশ্ন বটে। তার কারণ একটা বিরাট বড় বট গাছ। তার ডালপালা, শেকড়-বাকড় যেন বাড়িটাকে আষ্টেপৃষ্টে জাপটে ধরে, একেবারে তার প্রাণ বার করে দেবার চেষ্টা করছে। এভাবে বাড়িটা কতদিন টিকে থাকবে বলা মুশকিল। বাড়িটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে একটা পায়ে হাঁটার ব্রীজ, স্টীলের তৈরী, যেটা একটা মরা খালের ওপর দিয়ে চলে গিয়ে, ওপাশে একটা ঝোপ ঝাড় বড় গাছপালা মিশ্রিত মিনি জঙ্গলে হারিয়ে গেছে। ম্লান দিনের আলোতেও বোঝা যাচ্ছে যে ওদিকটা বেশ ঘন। বসতি যে ওদিকটায় নেই বলাই বাহুল্য। আমাদের দিকে বসতি হলেও তা অনেকটা দুরে, এবং যা আছে তা সমস্তই বড় বড় কমপাউন্ডওয়ালা আর্মির বাড়ি। এই সব বাড়িগুলো থেকে আলোর যা ছিটেফোঁটা আসছে তাতে পরিবেশটা

হয়ে উঠেছে আরো গা ছম ছমে এবং রহস্যময়।

"ঠিক আছে," বললাম আমি। মনে হলো বাড়িটায় ভূত থাকলেও থাকতে পারে। "কটায় আসবি?"

"টেন-ইশ?" বললো অনীশ। "মানে রাত্তির দশটা-টশটায়? উইথ কার্বলিক অ্যাসিড, টর্চ অ্যাণ্ড কফি?"

"ওকে", আমি মাথা নাড়লাম। কার্বলিক অ্যাসিড সাপ, পোকামাকড় তাড়াবে, আর কফি তাড়াবে ঘুম, যদিও ঘুম কতখানি আসবে বলা মুশকিল।

"ভেতরটা একবার দেখবি নাকি?" অনীশ জিজ্ঞেস করলো।

আমি কোনো কথা না বলে এগিয়ে গেলাম। বাড়ির ভেতর কে বাড়ির ভেতর না বলে ঘরের ভেতর বলাই ভালো, এবং সেটার অবস্থা দেখি বাইরের মতোই তথৈবচ। বৃটিশ আমলের সরু সরু ইঁট দেওয়ালে যেন কোনো রকম ভাবে সেঁটে আছে, আর তারই মধ্যে দিয়ে বটগাছের শেকড়-বাকড় উঁকি মারছে। দরজা আছে, দুটো জানলাও আছে, তবে বলা বাহুল্য তাতে কোনো ফ্রেম নেই।

"কাগজ আর ঝাঁটাও নিয়ে আসতে হবে রে," মেঝেতে ধূলোর পরিমাণ দেখে মন্তব্য করলাম আমি, "না হলে আর বসা যাবে না।"

অনীশ দেখি এক দৃষ্টে হাড়-পাঁজরা বের করা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি ওর দিকে তাকাতেই ও দেওয়ালের একটা বিশেষ দিক দেখিয়ে বললো—"আমার মনে হয় এখানেই ঘোড়াগুলো দাঁড়াতো। দেওয়ালের এখানটায় যে খাঁজটা দেখছিস, খুব সম্ভব এখানেই লোহার পাত ফিক্স করা থাকতো আর তাতেই ঘোড়াগুলোকে বাঁধা হতো দড়ি দিয়ে। টেগার্ট অন্যান্য সাহেবদের মতো সহিসের হাতে ঘোড়া তুলে দিয়ে লাটসাহেবের পার্টিতে যেতেন, যদিও শুনেছি তাঁর সময়জ্ঞান ছিলো ভয়ংকরী, কারণ তিনি ছিলেন যাকে বলে বেহেড মাতাল।"

আমি খেয়াল করলাম যে ওই জায়গাটায় ঘরের মেঝেগুলোও দেয়ালের মতো ইঁট বার করে আছে। সেদিকে অনীশের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে ও জবাব দিলো—"দেখেছি। এটাই যে আস্তাবল ছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মেঝেতে ওরকম থাকলে ঘোড়ার চলতে সুবিধে হয়। এটা হলো ইংরীজিতে যাকে বলে কব্‌ল্ড স্ট্রীট। অনেক পুরোনো ট্রাম লাইনের ওপর দেখবি এটা আছে আর ভবানীপুরের জগুবাবুর বাজারের কিছু অংশে তো আছেই।"

"সেখানে আবার কেন রে?"

"ওটাও এক কালে আস্তাবল ছিলো।"

আরো মিনিট পাঁচেক দেখে আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। একটা জিনিস খেয়াল করেছি যে বাড়িটার দেওয়ালে পোকা-মাকড়, মাকড়সার জাল নেই বললেই চলে। ঝুল যা আছে সামান্য।

বাড়িটার বাইরে একটা ব্রীজ আছে আগেই বলেছি। এবার লক্ষ্য করলাম যে সেটা বাড়ির বাঁদিকে। বাড়িটার ডান দিকে একটা এবড়ো-খেবড়ো সিমেন্টের রাস্তা, যার একটা প্রান্ত এঁকে বেঁকে হারিয়ে গেছে আর্মি ক্যানটনমেন্ট-এর দিকে, আর অন্য দিকটা একেবারে সোজা বেশ কিছুটা গিয়ে স্ট্রেট মিশেছে ব্যারাকপুরের মেন রোডে-এর সঙ্গে। আমরা ওই দিক দিয়েই হেঁটে এসেছি, ওই দিক দিয়েই ফিরবো। আসার সময় খেয়াল করিনি, এবার খেয়াল করলাম রাস্তার দু ধারে বেশ ভালোই জঙ্গল। তার পাশেই খালটা উঁকি মারছে।

"এই রাস্তাটা সোজা চলে গেছে মঙ্গল পান্ডে পার্ক," আর্মি ক্যানটনমেন্ট-এর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো অনীশ। "ভারী মনোরম জায়গা। যদি সবকিছু ভালোয় ভালোয় উৎরে যায়, তাহলে কাল সকালে আমরা এক রাউন্ড মর্ণিং ওয়াক উইথ লেমন-টী সেরে আসতে পারি।"

আমি কোনো উত্তর দেবার আগেই একটা আওয়াজ শুনে ঘুরে দাঁড়ালাম। একটা দুধওয়ালা। সাইকেলে করে হয় দুধ বিলি করতে বেরিয়েছে বা করে ফিরছে। তার সাইকেলের দুপাশে ঝোলানো দুধের ক্যান। আমাদের দিকে কিরকম অবাক দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে সে চলে গেলো, আর আমরাও ঘরমুখো রওনা হলাম।

রাত্তির দশটা নাগাদ আমরা যখন এসে পৌঁছোলাম, তখন পুরো পরিবেশটা যে এতোটা চুপ চাপ হয়ে যাবে ভাবতেও পারিনি। বিকেলে যে আলোর ছিটে ফোঁটা ছিলো, তা একেবারে গায়েব হয়ে যাওয়াতে রহস্যময় ভাবটা কিছুটা কমে গেছে ঠিকই, কিন্তু একটা জমাট চাপা অন্ধকার যেন ভীষণ ভাবে আমাদের বুকের ওপর একদম চেপে বসে আছে। এক ঝিঁঝিঁ পোকার কন্সট্যান্ট ডাক আর মাঝে মধ্যে শেয়ালের ডাক ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই। বিকেলের ম্লান আলোতে স্টীলের ব্রীজটাকে দেখেছিলাম, এখন ফিকে চাঁদের আলোতে দেখলাম সেটা যেন একটা রূপোর মোটা ফিতের মত চকচক করছে। ট্রেকিং-এ সবসময় আমার সাধের অলিমপাস ক্যামেরা থাকে, কিন্তু এবার সেটাকে

আনিনি, থাকলে একটা খুব ভালো ছবি তোলা যেতো। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, চারপাশের জমাট অন্ধকারে একটা নক্সা কাটা রূপোলী স্টাকচার যেন শূন্যে ভাসছে।

মিনিট পাঁচেক-এর মধ্যে আমরা একটা অপেক্ষাকৃত কম ধূলোওয়ালা জায়গাকে টর্চ আর কাগজের সাহায্যে পরিষ্কার করে, মাটিতে বসে পড়লাম। খেয়াল করলাম গরমকাল হলেও মাটিটা সে অনুপাতে বেশ ঠান্ডা।

কাগজের কাপে কফি ঢালতে অনীশ বললো— "বেশ অনেকক্ষণ ধরেই জেগে থাকতে হবে মনে হয়। আশা করি কফিটা কাজে দেবে।"

"কার্বলিক অ্যাসিড ছড়াবার প্রয়োজন আছে কি?" কফিতে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি। বেড়ে বানিয়েছে কফিটা উদয়। রাত্তিরে ডিমের ডালনা আর গরম রুটিও হয়েছিলো তোফা। ছোকরার যে রান্নার হাত আছে কোনো সন্দেহ নেই।

অনীশ উঠে দাঁড়িয়ে, নিঃশব্দে ছিপি খুলে, বোতল থেকে কিছুটা অ্যাসিড আমাদের চারপাশে ফোঁটা ফোঁটা করে ছড়িয়ে দিলো। আসলে মেঝেতে বেশী অ্যাসিড দিলে সেটা যদি আবার আমাদের দিকে গড়াতে আরম্ভ করে, তাহলে উল্টে বিপত্তি হবার চান্স আছে।

বলা বাহুল্য আমাদের কথাবার্তা চাপা গলায় হচ্ছিলো, আর টর্চও আমরা জ্বালিনি, কারণ জানলা দিয়ে ভালোই চাঁদের আলো আসছে, আর তার জেরে আমরা সব দেখতে পাচ্ছি, যদিও চন্দ্রদেবকে দেখতে পাচ্ছি না।

"জানলা থেকে একটু সরে বস্," চাপা গলায় মন্তব্য করলো অনীশ, "পাশেই আর্মি ক্যানটনমেন্ট। কারুর যদি চোখে পড়ে অন্ধকারে আমরা এরকম ঘাপটি মেরে বসে আছি, তাহলে আর যাই হোক, আমরা যে সাহেব ভূতের দর্শনপ্রার্থী তা কেউ বিশ্বাস করবে না।"

কথাটা মন্দ বলেনি অনীশ। মাটিতে ঘষটে সরে আসতেই একটা বিকট আওয়াজ কানে এলো। ঝিঁঝিঁ পোকার কন্সট্যান্ট ডাক আর মাঝে মধ্যে শেয়ালের 'হুক্কা হুয়া', জমাট অন্ধকার, ভরা নিস্তব্ধতাকে যেন একেবারে ছারখার করে দিলো এই পিলে চমকানো কর্কশ অথচ বিষাদময় সুর।

"প্যাঁচা," অম্লানবদনে বলে উঠলো অনীশ।

আমি কোনো কথা না বলে জলের বোতল থেকে এক ঢোঁক জল খেয়ে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিলাম। অনীশ স্রেফ তাকালো আমার দিকে, কোনো মন্তব্য করলো না।

"এগারো," একটা চাপা নিঃশ্বাস ছাড়ার মতো আওয়াজ করে বলে উঠলো অনীশ। অর্থাৎ আমরা আসার পর স্রেফ একটি ঘন্টা কেটেছে। আরো ঘন্টা ছয়েক আমাদের এরকম ভাবে কাটাতে হবে, কারণ ভোর পাঁচটার আগে দিনের আলো ফুটবে বলে মনে হয় না। যদি মিস্টার ভূতের দর্শন পাওয়া যায় আশাকরি তারই মধ্যে হবে। কোনো কিছু পেতে গেলে যে অসীম অধ্যাবসায়, ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতার প্রয়োজন এবং ভূত দর্শনও যে কোনো একসেপশন নয়, তা বিলক্ষণ মালুম হতে লাগলো আমার। রাত বাড়ছে। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক একটু ম্লান হলো কি? এই বাড়িতেই তো টেগার্ট সাহেব-এর অপঘাত মৃত্যুর কথা বলছিলো অনীশ। সেই ঘরটা কি এখনো অবশিষ্ট আছে? একটা আস্তাবলে এক নীলকুঠির দোর্দন্ড প্রতাপ ফিরিঙ্গি জমিদার-এর মৃত্যু হয় কি করে? যে ঘরে হয়েছিলো সে ঘরটা নিশ্চয়ই এ বটগাছের চাপে পড়ে ভেঙে গেছে। তাহলে সে সাহেব ভূত এই ঘরে আসবে কি? আর ওসব ভাববো না। ভেবে লাভ নেই। যদি কপালে থাকে তাহলে দেখা হবে তা না হলে ব্যাড লাক!

আরেক রাউন্ড কফি নেবার জন্য হাতটা বাড়িয়েছি, এমন সময় আওয়াজটা কানে এলো। সময়টা আমার বেশ মনে আছে, কারণ ঠিক তক্ষুণি আমার কোয়ার্টজ ঘড়িতে পিঁক পিঁক করে বারোটা বাজলো। আওয়াজটা'র মধ্যে একটা রাজকীয় গাম্ভীর্য আছে, একটা বনেদিয়ানা আছে, যেটা আজকাল একদম শোনা যায় না। পরমুহূর্তেই বুঝতে পারলাম সেটা কি। একটা গির্জার ঘড়ির আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে খটকা লাগলো। এই গন্ডগ্রামে গির্জে এলো কোথ্থেকে? থাকলে নিশ্চয়ই বলতো অনীশ। ওকি জানেনা এটার অস্তিত্ব? কিন্তু তাতো মনে হয় না। ও'র কথাবার্তা শুনে মনে হয় ওর রীতিমতো পড়াশোনা আছে ব্যারাকপুর সম্বন্ধে। ও'কে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে ও'র দিকে তাকিয়ে দেখি, ও দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। মাথাটা নীচু, চোখটা বোজা। ও'কি ঘুমিয়ে পড়লো নাকি? ঘুমিয়ে পড়ার ছেলে তো ও নয়। ওই তো ও'র পাশেই রাখা আছে আধ খাওয়া ব্ল্যাক কফির কাগজের গেলাশ। ও'কে ডাকতে গিয়েই বাইরে থেকে আসা একটা মৃদু কমপনের আওয়াজ শুনে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতেই আমার বুকের রক্ত একেবারে হিম!

সেই স্টীলের ব্রীজটা। অল্প অল্প কাঁপছে সেটা। রূপোলী রঙটা আর তাতে নেই, বরং তাতে একটা রুক্ষ তামাটে ভাব এসেছে। বেশ বুঝতে পারছি যে ওটা আর স্টীলের নয়, সমপূর্ণ কাঠের, এবং ওই ফিকে চাঁদের আলো থেকে বুঝতে পারছি যে রীতিমতো দুলছে সেটা। তার দরূণ-ই সে আওয়াজ যেটা আমি শুনতে পেয়েছিলাম। আওয়াজের কারণ একটা ছায়ামূর্তি। কাঠের ব্রীজের ওপর ছায়ার ঘোড়ার ওপর চেপে সোজা তীরবেগে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। ফিকে আলোর ওপর দুটো আধকালো ছায়া, তাদের কিছু কিছু জায়গায় আলো পড়ে যেন ক্ষণিকের বিদ্যুতের মত চকচক করছে, আর গির্জার গুরু গম্ভীর আওয়াজ ছাপিয়ে ভেসে আসছে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ "খড়াকট..... খড়াকট..... খড়াকট..... খড়াকট....."

আওয়াজটা যেন চতুর্দিকের জঙ্গলের নিস্তব্ধতাকে একেবারে ভেঙে খান খান করে দিচ্ছে। এক ঝলক তাকিয়ে দেখি বন জঙল যেন আরো ঘন, আরো গভীর, আরো অবিন্যস্ত। খালের জল? সেটা আর খাল নয়, রীতিমতো নদী। গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে কি? জানি না। স্রেফ শুনতে পাচ্ছি সেই আওয়াজ, যার একটা তাল আছে, লয় আছে, ছন্দ আছে। এবার গির্জার ঘড়ির আওয়াজটা শেষ হতেই যেন ঘোড়ার খুরের আওয়াজটা শতগুণ বেড়ে গেলো, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঘর ভরে গেলো এক বিদেশী সেন্ট, আতর, আর ঘোড়ার গন্ধ মেশানো এক বিচিত্র গন্ধে। তার পরেই শুনলাম পরিষ্কার সাহেবী উচ্চারণে এক মরণ হুঙ্কার—"হারি আপ অ্যান্ড চেনজ মাই হর্সেস শু—ইউ ডার্টি নিগার!"

পরমুহূর্তেই আমার হাতের খুব কাছেই কি একটা সড়াৎ করে কি এসে পড়লো। আমার সেদিকে তাকাবার শক্তি নেই, কারণ বেশ বুঝতে পারছি যে আমার সামনে যে ছায়ামূর্তি এসে উপস্থিত হয়েছেন, তিনিই সেই কুখ্যাত উইলিয়াম টেগার্ট-এর প্রেত্মাতা ছাড়া আর কেউই নয়। পাশেই আরেকটি ছায়া, তবে সেটা মানুষের নয় ঘোড়ার। সেটা ফোঁস ফোঁস করে ঘাড় নাড়ছে। টেগার্ট এর ছায়া এবার ঘোড়া থেকে নেমে এক পা এক পা করে আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। এবার সেটা দাঁড়িয়ে পড়লো একটা জায়গায়। অনীশ যে জায়গাটাকে আস্তাবল বলেছিলো, ঠিক সেই জায়গাটায়। এবার তার হাতটা উঠলো। কি আছে তার হাতে? একটা সরু ফিতের মতন। চাবুক নাকি?

সাহেব ভূত হোক আর যে হোক, ফের যদি ওটা আমাদের দিকে ধার্য হয় তাহলে.....

একটা আওয়াজ শুনে দেখি অনীশ উঠে দাঁড়িয়েছে। সে যেন অর্ধচৈতন্য-এর মতো টেগার্ট-এর ঘোড়ার দিকে এগিয়ে চলেছে। তারপরে আমার বিস্ফারিত নেত্রে-র সামনে সে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো টেগার্ট-এর ঘোড়ার ছায়ামূর্তি-র একেবারে সামনে এবং মন্ত্রমুগ্ধের মত কি একটা নিয়ে ডান হাতে হঠাৎ-ই যেন জাপটে ধরলো ঘোড়ার বাঁ পায়ের খুর। পরমুহূর্তেই শুনলাম এক রক্ত হিম করা অশরীরী "চি হি - হি - ঈ - ঈ" আর্তনাদ, আর তারপরেই দেখি সেই ঘোড়ার ছায়ামূর্তি নিজের পেছনের পা দুটোকে সজোরে গিয়ে মারলো তার-ই মনিবের গায়ে এবং সমস্ত নিস্তব্ধ অন্ধকার কে ছাপিয়ে শুনলাম টেগার্ট-এর এক মরণার্ত চীৎকার- "ইউ ডার্টি নিগার, আই উইল কিল ইউ!"

এক অপার্থিব শক্তি যেন আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়, মন, চেতনাকে এক লহমায় গ্রাস করে আচ্ছন্ন করে তলিয়ে নিয়ে চলেছে ঘোর অন্ধকারে, কিন্তু সেই সংকটময় মুহূর্তে আমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে দেখলাম উইলিয়াম টেগার্ট-এর চাবুক হাতে আমাদের মারতে উদ্যত ছায়ামূর্তি যেন হঠাৎ নিষ্প্রাণ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো; আর রাত্রের সমস্ত জমাট নিস্তব্ধতা আমার মনকে যেন একেবারে তলিয়ে নিয়ে গেলো ঘোর গভীর অন্ধকারে।

"বাবুজী! বাবুজী!"

ঘুমটা ভাঙলো কার ঠেলাতে। ধড়মড়িয়ে উঠে দেখি কালকের সেই দুধওয়ালা। চিন্তিত মুখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি চোখ মেলে তাকাতেই সে জিজ্ঞেস করলো—"সোব ঠিক হ্যায় তো বাবুজী? কল সাঁঝে হামি দেখলাম কি অপলোগ ইখানে ঘুর ঘুর কোরিছেন। সোচলাম কি বোলি ইয়ে ভূত বাংলা হ্যায়—যাবেন না। এখুন যাচ্ছিলাম তো সোচলাম একবার দেখে লি। সোব ঠিক আছে তো?"

ভোর হয়েছে। কালকের রাত্তিরের সেই নিস্তব্ধতা মিশ্রিত ভয়াবহ অভিজ্ঞতা-র তো নাম গন্ধ তো নেই-ই, বরং চারিদিকে একটা শাশ্বত স্নিগ্ধ রূপ মনটাকে আরো শান্ত করে তুলেছে। কোথায় যেন কোকিল ডেকে উঠলো। পাশ ফিরে দেখি অনীশ। ঘুমোচ্ছে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক মনে হলো। আমি দুধওয়ালাকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনীশকে ঠেলে তুললাম। কোথায় যেন একটা মার্চিং এর আওয়াজ পেলাম। বুঝলাম

আর্মি-র লোকেরা নিজেদের ডেইলি ফিটনেস প্রোগ্রাম আরম্ভ করে দিয়েছে। অনীশ আমার দিকে চোখ মেলে তাকাতেই, আমি ইশারায় আমাদের নতুন অতিথি-র উপস্থিতি-র কথা জানাতে, সেও বুঝতে পেরে রাত্তিরের অভিজ্ঞতা'র কথা কোনো উল্লেখ না করে, দুটো আজে বাজে এক্সকিউজ দিয়ে, গায়ের ধুলো ঝেড়ে, জিনিসপত্তর গুটিয়ে আমরা বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম। বাইরে এসে দেখি জঙ্গল-এর সেই গভীর ভয়াবহ ভাব টাও নেই আর খাল-টা আর ব্রীজ-টা ও নিজের পুরোনো চেহারায় ফিরে গেছে।

"তোদের পুর্বপুরুষের মধ্যে যে কেউ সহিস ছিলেন জানতিস?" সেদিন সন্ধ্যেবেলায় আমি জিজ্ঞেস করলাম। আমি আর অনীশ ও'র ছাতের ওপর এসে বসেছি। সাতটা বাজে। উদয় কিছুক্ষণ হলো আমাদের তরমুজের শরবৎ দিয়ে গেছে। অনীশ কোথায় সারাদিন টো-টো করে ঘুরে এইমাত্র ফিরেছে। সারাদিনে ও'র সঙ্গে আমার এই প্রথম কথা হলো।

"ছিলেন না," নিজের ডেক চেয়ারে বসে বেশ জোর দিয়ে-ই বললো অনীশ। তারপর নিজের শরবৎটা তে একটা চুমুক দিয়ে কিছুক্ষণ পরে বললো—"উইলিয়াম টেগার্ট-এর মৃত্যু দিনও জানতে পারলাম।" আমি তাকিয়ে রইলাম অনীশের দিকে। আমার মনে একটা সন্দেহ দানা বাঁধছে, কিন্তু তবুও উত্তর ওর কাছ থেকে শোনা যাক। "২২ শে মে ১৮০৮," আপনমনে বলে উঠলো সে। তারপর আমার দিকে ফিরে বললো—"এটা নিয়ে একটা মতভেদ ছিলো, আজ কনফার্মড হলাম।"

অর্থাৎ গত রাত্তির বারোটায় কুখ্যাত অত্যাচারী উইলিয়াম টেগার্ট-এর মৃত্যু-র দুশো বছর হলো, কিন্তু কে যে তার অত্যাচারী হাত থেকে বিপন্ন লোকেদের উদ্ধার করেছিলেন, সেটা কি অনীশ জানতে পেরেছে?

"শুনেছিলাম আমার এক পুর্বপুরুষ দেবীপ্রসাদ সিংহ-এর অকালমৃত্যুতে আমরা জমিদারী ছেড়ে ব্যবসার পথে অগ্রসর হই," অনীশের গলা যেন বহুদূর থেকে ভেসে এলো। দেখি সে উঠে দাঁড়িয়ে পেছনে হাত দিয়ে পায়চারি করছে। আমি চুপ করে রইলাম। সাড়ে সাতটা প্রায় বাজে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন হঠাৎ চারিদিক কিরকম চুপচাপ হয়ে আসছে। "বাবা পুকুরটাকে এড়িয়ে চলতে বলতেন," নিস্তব্ধতা ভেদ করে ভেসে এলো অনীশের গলা। "কোনোদিন কারণ বলেন নি, কিন্তু আজ অন্য অনেক কিছু জেনেছি। সেই কারণ যাচাই করতে আমাকে পুকুরপাড়ে যেতে হবে। এক্ষুণি!"

শেষ কথাটা যে ভাবে বলে উঠলো অনীশ আমার মোটেই ভালো লাগলো না। কিরকম যেন একটা হিংস্র, ধারালো ভাব আছে তাতে। "মানে?" আমি বেশ বিরক্ত হয়েই উঠে দাঁড়িয়ে বললাম। "এই রাত্তিরবেলা পুকুরপাড়ে যাবি কেন? বিশেষতঃ তোর বাবা যখন বারণ করে গেছেন?"

এক মুহুর্তের জন্য অনীশ তাকিয়ে রইলো আমার দিকে, তারপর এক ঝটকায় আমাকে ঠেলে সরিয়ে ফেলে দিয়ে, পুরো ঘুরে দৌড়োলো সিঁড়ির দিকে।

"অনীশ! দাঁড়া!" এক অজানা আতঙ্ক-এ এক ভয়ার্ত চীৎকার বেরিয়ে এলো আমার গলা দিয়ে আপনা আপনিই, কারণ অনীশের এই হঠাৎ ঝটকাতে মনে হচ্ছে এক উন্মাদনার বশে তার দেহে অমানুষিক শক্তির সঞ্চার হয়েছে, যা আমার পক্ষে রোধ করা সম্ভব। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওর পেছন পেছন দৌড়োলাম আমি। কি যে ও'র মাথায় চেপেছে ও'ই জানে। আটকাতেই হবে ও'কে, কিন্তু কি করে আটকাবো জানি না। উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলাম অনীশের পেছনে, কারণ সে যে অনেকখানি নীচে নেমে গেছে বুঝতে পারছি তার পায়ের আওয়াজে, যদিও সে মোটেই এভাবে দৌড়ঝাঁপ করার ছেলে নয়।

যখন সিঁড়ি দিয়ে ফ্ল্যাটের একদম তলায় নেমেছি, তখন আমার কোয়ার্টজ ঘড়ির আওয়াজে বুঝলাম

সাড়ে সাতটা বাজলো। সঙ্গে সঙ্গে এক তীব্র আলোর ঝলসানি মিশ্রিত দম ফাটা বাজ পড়ার আওয়াজে আমার চোখ কান মন সাময়িক ভাবে একেবারে যেন নিশ্চল হয়ে গেলো। ছাতে বসে থাকতে মেঘের কোনো চিহ্ন দেখিনি, তাহলে বাজ পড়ে কি করে? মনে হচ্ছে যেন, একেবারে পুকুরের মধ্যেই পড়েছে। কিন্তু অনীশ? কোথায় সে?

প্রাথমিক ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে একটু ঠাহর হতেই দেখি অনীশ তার ফ্ল্যাটের গাড়ির পার্কিং লট-এর কাছেই জবুথবু হয়ে বসে আছে। যেভাবে দৌড়োচ্ছিলো সে, তাতে তার এখন পুকুর পাড়ে থাকার কথা, এবং যদি এ সময় সে সেখানে থাকতো তাহলে কি হতো ভাবতেই শিউরে উঠলাম আমি, কারণ বাজটা যে ওখানেই পড়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মোক্ষম মুহূর্তে যে ও কোনো কারণেই হোক আটকে গেছে সেটা বলাই বাহুল্য।

এক নিমেষে ও'র কাছে গিয়ে পৌঁছোতেই কিরকম ভাবলেশহীন দৃষ্টি নিয়ে তাকালো আমার দিকে। তারপর তার গলা পেলাম—"আমি এখানে এলাম কি করে বল তো?"

প্রশ্নটা শুনে আমার শিরদাঁড়ায় একটা শিহরণ খেলে গেলেও নিজেকে স্টেডি করলাম, কারণ খেয়াল করলাম যে তার গলা একেবারে স্বাভাবিক এবং তার মধ্যে সে কিছুক্ষণ আগে একটা হিংস্র, ধারালো ভাব ছিলো সেটা একেবারে নেই। "কিসের ঘোরে যে ছুটছিলাম জানিনা আমার সাহায্যে উঠে দাঁড়িয়ে বললো অনীশ। "তারপরে একটা কিছুতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। কয়েক মুহূর্তের জন্য বোধহয় সেন্সলেসও হয়ে গিয়েছিলাম। জিনিসটা কি বলতো?"

অনীশের হাঁটু আর কনুই-এর কাছটা সামান্য ছড়ে গিয়েছিলো, কিন্তু সেটাকে পাত্তা না দিয়ে, ও'র সঙ্গে আমিও খোঁজা খুঁজি করছিলাম, এমন সময় অনীশের চাপা উল্লাসে বুঝলাম সে জিনিসটা খুঁজে পেয়েছে। কিছুই না, একটা পাতলা লোহার ছড়, মাটি থেকে সামান্য উঁচিয়ে একটা ঘোড়ার নালের মত শেপ নিয়ে বেরিয়ে আছে, আবছা আলোতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সেটা। রাত্তির বেলা কেউ ওখান দিয়ে অনীশের মতো দিকবিদিগজ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটলে পা হোঁচট খেয়ে পড়বেই, এবং অনীশের মতন সামান্য চোটের ওপর দিয়ে নাও পার পেয়ে যেতে পারে। সে কথাটা ভেবে অনীশ এগিয়ে এসে ছড়টাকে মাটি থেকে টেনে তোলার চেষ্টা করলো। এরপর আমাদের দুজনকার সামনে, আমাদের দুজনেরই দম বন্ধ করে, ঘাম ছুটিয়ে, সে মাটিতে বসানো ঘোড়ার নালের আকৃতির লোহার ছড় অনীশের ওই আলতো টানে, নিজের সমপূর্ণ সলিড অবস্থা থেকে, আস্তে আস্তে ক্ষয়ে ক্ষয়ে, ঝুর ঝুর করে পরিণত হলো খয়েরী রঙের গুঁড়োতে।

সেই দমবন্ধ রুদ্ধশ্বাস করা অবস্থায় শুনলাম অনীশের ধরা গলা—"দেবীপ্রসাদ সিংহ নিজের গরীব মুসলমান প্রজাদের ওপর উইলিয়াম টেগার্ট-এর অত্যাচারের সহ্য না করতে পেরে তাকে চরম শিক্ষা দেবার অভিপ্রায়ে সাহিস সেজে তার ঘোড়ার নাল পাল্টাবার ছলে ছুরি দিয়ে তার খুরে আঘাত করেন। তারপর সেদিন সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার সময়, অর্থাৎ এখন থেকে ঠিক দুশো বছর আগে স্নান করতে গিয়ে বজ্রবিদ্যুৎ-এ মৃত্যু হয় তাঁর নিজের ভিটের এই পুকুরেই।"

ছবি: সুদীপ্ত দত্ত

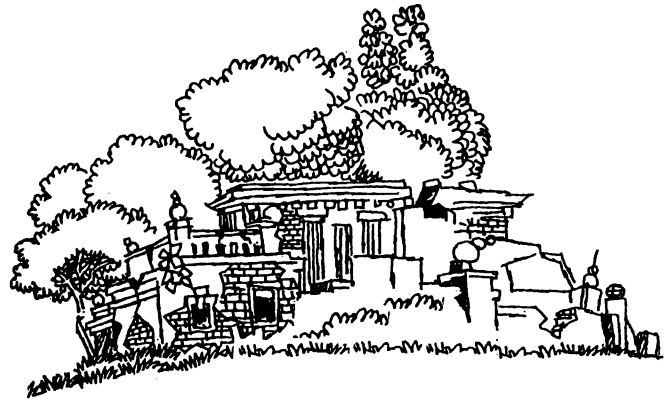

ভূত নিয়ে গবেষণার যন্ত্রপাতি

প্রযুক্তিবিদ

বেশ কয়েক বছর আগে একটা চমৎকার ইংরেজি সিনেমা দেখানো হয়েছিল কলকাতায়—"গোস্টবাস্টার্স" (Ghostbusters)। গল্পে এক মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূত নিয়ে গবেষণা করছিলেন কয়েকজন বৈজ্ঞানিক। তাঁদের গবেষণার জন্য সরকারী সাহায্যের দরখাস্ত খারিজ হয়ে গেলে তাঁদের সকলের চাকরি ছুটি হয়ে যায়। তখন তাঁদের উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি ব্যবহার করে তাঁরা ভূত ধরার ব্যবসা শুরু করেন, নাম দেন 'গোস্টবাস্টার্স'! যাদের বাড়িতে ভূতের উপদ্রব তাদের কাছে পয়সা নিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা তাদের বাড়ির ভূত ধরে নিয়ে আসতেন। গল্পের মূল প্লটটি ফাঁস করব না, সিনেমাটির সিডি/ডিভিডি হাতে পেলে দেখে উপভোগ কোরো!

ভূতের উপদ্রবের কথা শুনলে সেই বৈজ্ঞানিকেরা বহুবিধ যন্ত্রপাতি নিয়ে দেখতে যেতেন কোথায় কিরকম ভূত আছে। তাঁদের ভূত ধরার যন্ত্র অবশ্য অন্যত্র পাওয়া যায় না, কিন্তু ভূতের খোঁজে তাঁরা যেসব যন্ত্র ব্যবহার করতেন সেরকম যন্ত্র সত্যি কিনতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন কাজে প্রয়োজনীয় যন্ত্রকে ভূতের খোঁজে ব্যবহার করা যায়। তার (প্রধানতঃ) মার্কিনদেশে বহু সহস্র শখের "ভূত-গবেষক"-রা এই সব যন্ত্র নিয়ে আজকাল নানা ভূতের বাড়িতে তল্লাসী করে যান।

ভূত নিয়ে গবেষণা করার যন্ত্রের মধ্যে থাকে ঃ

(১) অন্ধকারে দেখার 'নাইটভিশন বাইনোকুলার' ও ছবি তোলার 'ইনফ্রা-রেড ক্যামেরা';

(২) দূর থেকে তাপমাত্রা মাপার "নন্-কন্ট্যাক্ট থার্মেমিটার";

(৩) তেজস্ক্রিয়তা মাপার গেইগার কাউন্টার;

(৪) চৌম্বক ক্ষেত্র মাপার যন্ত্র;

(৫) বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র ও বৈদ্যুতিক চার্জ মাপার যন্ত্র;

(৬) ল্যাপটপ কম্পুটার; এবং

(৭) ট্রেমোলো মিটার।

সব আধুনিক সেনাবাহিনীতে রাতে যুদ্ধ করার জন্য ব্যবহার 'নাইটভিশন বাইনোকুলার'। ব্যাটারীচালিত এই যন্ত্র আলোকে ৩০,০০০ গুণ অবধি বাড়িয়ে তোলে—যাতে চাঁদবিহীন রাতের তারার আলোর দৃশ্যও যন্ত্রের স্ক্রিনে দিনের আলোর মতো ঝকঝকে হয়ে ওঠে।

ইনফ্রারেড 'নাইটভিশন ক্যামেরা'তে অতিলোকিত আলোকরশ্মি ফেলে তার প্রতিফলনের ছবি তুলে সম্পূর্ণ অন্ধকারেও ছবি তোলা সম্ভব। ইনফ্রারেড ক্যামকর্ডার যন্ত্রে অন্ধকারেও 'মুভি' তোলা যায়। এই সব যন্ত্রে কোনও অতিপ্রাকৃতিক ঘটনার ছবি তুলতে গেলে ক্যামেরাটিকে সাধারণত তেপায়া স্ট্যান্ডের উপর বসানো হয়।

কারখানায় গরম লোহা বা কোনও চুল্লীর তাপমাত্রা মাপতে ব্যবহার হতো নন-কন্ট্যাক্ট থার্মোমিটার। যে কোনও গরম জিনিসের দূর থেকে তাপমাত্রা মাপে যন্ত্রটি সেই জিনিস থেকে বিকীরিত তাপরশ্মির বিশ্লেষণ করে।কোনও ভৌতিক ঘটনায় তাপ সৃষ্টি হলে এই যন্ত্র দিয়ে তা দূর থেকে মাপা যায়।

গেইগার কাউন্টার দিয়ে তেজস্ক্রিয়তা মেপে দেখা হয় যে তথাকথিত ভূতের বাড়ির মেঝে থেকে তেজস্ক্রিয় র‍্যাডন গ্যাস নির্গত হয় কিনা। পাথুরে জমিতে তৈরি কিছু বাড়িতে এরকম তেজস্ক্রিয়তার ফলে কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে যা ভুল করে ভূতের উপদ্রব বলে মনে হতে পারে।

অনেক অতিপ্রাকৃতিক ঘটনায় চৌম্বক ক্ষেত্র ও স্থিরবিদ্যুৎ যুক্ত থাকে। চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন প্রথমত মাপা হয় কম্পাসের সাহায্যে। আধুনিক ট্রিটিয়ামযুক্ত কম্পাসের কাঁটা জ্বলজ্বল করে বলে সম্পূর্ণ অন্ধকারেও যন্ত্রকে ব্যবহার করা যায়। ভূতের প্রভাবে চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি হলে তা মাপা হয় বিভিন্ন ধরনের গস্‌মিটার ও ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক ফিল্‌ড্‌ টেস্টার দিয়ে।

স্থিরবিদ্যুতের প্রভাবে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের পরিবর্তন মাপা হয় ফিল্‌ড্‌ স্ট্রেংথ মিটার দিয়ে—এটি কেব্‌ল্‌ টিভির মেকানিকেরা হরবকত যে যন্ত্র নিয়ে ঘোরেন তারই জাতভাই। হাওয়াতে অতিপ্রাকৃতিক ঘটনায় বৈদ্যুতিক প্রভাব মাপতে ব্যবহার করা হয় 'আয়ন কাউন্টার'। ঝড়, আগুন ইত্যাদি বহু প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াতে ঘরের মধ্যের হাওয়াতেও প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে পাঁচশো অবধি আয়ন সৃষ্টি হয়। কিন্তু কোনও কোনও ভৌতিক প্রক্রিয়াতে হাওয়াতে আয়ন সৃষ্টি হয় এর বহুগুণ বেশি। তার জন্য বিশেষ মডেলের যন্ত্র পাওয়া যায় যাতে ঘন সেন্টিমিটারে দু'লক্ষ আয়ন অবধি মাপা সম্ভব।

আধুনিক ভূত-গবেষকরা অনেক সময় রাত্রে এই সব যন্ত্রপাতি একটি হানাবাড়িতে রেখে তা একটি ল্যাপটপ কম্পুটারের সঙ্গে জুড়ে দেন যাতে কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হবে সব যন্ত্র। তখন গবেষকদের অনুপস্থিতিতে সম্পূর্ণ অন্ধকারে কোনও ঘটনা ঘটলেও তার ছবি ও তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগৃহীত হয়ে যায়।

কখনও-সখনও যাঁরা ভূতের উপদ্রবের কথা বলেছেন তাঁরা কোনও কারণে ইচ্ছে করে মিথ্যে কথা বলতে পারেন। এটা বুঝবার জন্য ব্যবহার করা হয় 'ট্রেমোলো মিটার' বা 'ভয়েস স্ট্রেস অ্যানালাইজার'। পুলিশী অনুসন্ধানে মিথ্যে কথা ধরার জন্য যে পলিগ্রাফ যন্ত্র ব্যবহার করা হয় এই যন্ত্রটি তার ছোটভাই বলা যেতে পারে। সুবিধা এই যে কোনও লোকের কথা টেপ রেকর্ডারে তুলে নিয়ে পরে তার অনুপস্থিতিতে তার অজান্তে টেপ থেকে এই যন্ত্রে কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করা সম্ভব।

বেশ কিছু মার্কিনীর হবি আছে অবসর সময়ে ভূতের বাড়ি ও হানাবাড়ি খুঁজে খুঁজে সেখানে যন্ত্রপাতি নিয়ে গিয়ে ভূতের অনুসন্ধান করা। আজকাল তাঁরা সেই কাজে সঙ্গে নিয়ে যান কয়েক লাখ টাকা দামের বহুবিধ যন্ত্রপাতি। এর মধ্যে কিছু যন্ত্র এখন কলকাতাতেও সহজেই সস্তায় পাওয়া যায়। এত প্রচেষ্টাতেও অবশ্য ভূতের বিষয়ে কোনও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব খাড়া হয়নি। তবে এটা প্রমাণ হয়েছে যেগুলি ভৌতিক, অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা বলা হয় তাতে শুধু দেখা বা শোনার জিনিস ছাড়াও নানা ক্ষেত্রে তাপ, চৌম্বকক্ষেত্র ও স্থিরবিদ্যুৎ যুক্ত থাকে।

মূল ইংরিজি থেকে রূপান্তর ☆ শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

চুম্বক

মঙ্গলপুরের পদ্মপুকুরের জলের তলায় নেমেছে এক ব্যোমযান। যাত্রী তার একা অবতার। মস্ত একখানা মাথা, চোয়াল দুটো আছে চুমসে, এক কান, বসা চোখ আর একেক হাতে তিনটে আঙ্গুল।

অবতারের চোখে দুরবিনের শক্তি। কানে ভেসে আসে এক ক্রোশ দূরত্বের শব্দও।

অবতারের সোনালী ব্যোমযানের আভা পদ্মপাতার ফাঁকাফোঁকর দিয়ে চোখে পড়ে হাবার।

ওদিকে পদ্মবন থেকে সিকি মাইল দূরে মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী গগনলাল বাজোরিয়া শুরু করেছে মঙ্গলপুরের সুখাফাটা জমি খুঁড়ে জল বার করার কাজ। তদারকিতে রয়েছে ৩৫-৩৬ বছরের সুঠাম, সুপুরুষ, কেজো প্রকৃতির এক মার্কিন—জো ডেভলিন। বাজোরিয়া গণেশের প্রসাদ লাড্ডু খাওয়ায় ডেভলিনকে। প্রতিটি পদক্ষেপের ছবি তুলে রাখে বাজোরিয়ার ফটোগ্রাফার তারক। ক্যালকাটা হেরাল্ডের সাংবাদিক এসে আলাপ করে বাজোরিয়া আর ডেভলিনের সঙ্গে। ওর ইচ্ছে এই ড্রিলিং প্রজেক্ট নিয়ে ওর কাগজের জন্য একটা লেখা তৈরী করা। এর মধ্যে হাবা এসে বকশিস চায় ডেভলিনের কাছে। ডেভলিন জানায় একটা ডাব জোগাড় করে দিলে হাবার ভাল জুটবে বকশিস। ইংরেজিতে বলা ডেভলিনের আর্জি মোহন বাংলায় বুঝিয়ে দেয় হাবাকে। হাবা ছুট দেয় ডাবের সন্ধানে। ডেভলিনের জামা থেকে শুয়োপোকা সরিয়ে দেয় মোহন। বিষাক্ত পোকা জানা সত্ত্বেও ডেভলিন ভ্রূক্ষেপ করে না।

তারপর....... ?

।।৬।।

সত্যি বলতে কী জগা কুণ্ডুর ডাবঝাড়ে সেঁধিয়ে হাবার বুকে একটা ধুকপুকুনি শুরু হয়ে গেছলো। কী চোটপাট রে বাপ ওই ওট্টুকুল লোকটার! কোনও একটা গাছের ধারে দাঁড়ালেই হেঁই হেঁই করে ধেয়ে আসে হাবার দিকে। আর বাগে পেলে তো এই মারে কী সেই মারে। কুণ্ডুর মুখটা মনে আসতেই হাবা একটু থমকে পড়ল ডাবঝাড়ে। তার চোখ তুলে গাছে গাছে গাছা গাছা ডাব দেখে একটা নরম সবুজ স্বপ্নের মধ্যে হারিয়ে গেল যেন।

সবুজ সবুজ ডাবের তলায় দাঁড়িয়ে চোখ বুলোতে বেশ আরাম পায় হাবা। তখন গাছে চড়তেও ভুলে যায়। উই উদিকে জনার্দন খুড়োর বাগানে গুটি কয় ডাব পেড়ে দিলে একটা করে ডাব খেতে পেত হাবা। কিন্তু সে-খুড়ো কদ্দিন হল কোথায় গেছে কে জানে, তার বাগান এখন জঙ্গলে জঙ্গলে। আর তাই পাহারা দিচ্চে এখন খুড়োর কে একটা যেন। সবাই ডাকে খুড়োর কল। সেও হাবাকে দেখলে হেঁই হেঁই করে ছুটে আসে। ফলে হাবা আর উদিক মাড়ায় না।

সাহেবের টোপ খেয়ে আজ বেশ কিছুকাল পর জগা কুণ্ডুর ডাবঝাড়ে এসে উপস্থিত হাবা।

কিন্তু বুকের মধ্যে ভয় বাজছে। তবু ভয় করে পেট চলে হাবার? বকশিস আসবে কুত্থেকে? ও কপালে একটা নমো ঠুকে ত্রিড়িক ত্রিড়িক করে গাছে ওঠা ধরল। এভাবে গাছে ওঠা শিখিয়েছে ওকে কাঠবিড়ালীরা। কীরকম খপাৎ খপাৎ পা গেঁথে গেঁথে আর লাফ জুড়ে জুড়ে টং-এ চড়ে যায়।

হাবাও সেভাবেই চকিতে চড়ে গেল গাছে, আর একটা ডাব মুচড়ে খালাস করে নিক্ষেপ করল মাটিতে। কিন্তু ইস্! ডাবটা মাটিতে পড়ার আগে একটা তারের বেড়ায় ঠুকে গিয়ে ঝিকির ঝিকির আওয়াজ তুলে বসল। হাবা বুঝল সব্বোনাশ হয়েছে। এইবার ওই ওট্টুকুল শরীল গিয়ে কুণ্ডু মোশয় হেঁই হেঁই করে তাড়াতে আসবে। সাহেবেরটা ছাড়াও নিজের জন্যে একটা পাড়ার বাসনা ছিল হাবার। সে-গুড়ে বালি পড়তে ও তরতর করে গাছ থেকে নেমে পাড়া ডাবটা কুড়িয়ে দৌড় লাগাল।

আর এক্ষুনি 'ধর্ ধর্ ওই চোর! ওই চোর!' করে চিলচিৎকারে ধেয়ে এল জগা কুণ্ডু। এরপর আওয়াজ উঠল 'বদমাশ, বদমাশ! লক্ষ্মীছাড়া অপগণ্ড!' এক হাতে কোমরের লুঙ্গির গিঁট সামলাতে সামলাতে ওই ওট্টুকুল লোকটা দিব্যি জমি থেকে একটা ঢিল কুড়িয়ে হেনে দিলে হাবার মাথা টিপ করে!

আর লাগবি তো লাগ এক্কেবারে হাবার মাথার পিছোনটায়! হাবার এক হাতে ডাব, অন্য হাতে মাথা চাপা দিয়ে 'গেলুম মাগো!' বলে আছড়ে পড়ল মাটিতে। তারপর খাড়া হয়েই দৌড়তে গেল, যখন জলকলের আখড়া থেকে বাড়িফেরত মোহন ওকে দেখতে পেলে।

'কী হল রে! কী বাঁধলি' করে হাবার দিকে সুট্টে এল মোহন। দেখলে হাবা বাঁ হাত দিয়ে মাথা পিছু ঘষছে। মোহন আসতে কাচুমাচু মুখে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে ধরল। মোহন দেখল সে তালু এক চাপ রক্ত!

বলতে বলতে এসে পড়ল জগা কুণ্ডু, তখনও রাগে ফুঁসছে। হাবার দিকে মোহনের করুণার দৃষ্টি দেখে তার তিরিক্ষি মেজাজ আরওই তিরিক্ষি হল। কানে এলে হাবাকে বলা মোহনের চাপা স্বরের কথা, 'তুই যা।'

যা শুনে তক্ষুনি পিট্টান দিল হাবা। যা দেখে কটমটে চাউনি দিয়ে কুণ্ডু বললে, 'ব্যাটাকে ছেড়ে দিলেন বটে! জানেন ও .....'

কুণ্ডুর কথা ফুরোনো আগেই মোহন শান্ত গলায় বললে, 'কেন, ডাবটা কি আপনার?'

কুণ্ডু তখন্য ফুঁসে যাচ্ছে, 'আবার কার! নাহ্, দেখছি বজ্জাতটাকে একদিন পুলিশেই দিতে হবে!'

মোহন এর কোনও উত্তর করল না, চুপচাপ পকেট থেকে মণিব্যাগটা বার করল। তারপর আপদ চুকোতে সেই শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কী দাম হবে ডাবটার?'

তাতে কেমন যেন চুপসে গেল কুণ্ডু সহসা। বাক্য জোগাল না ঠোঁটে। মাথা নামিয়ে লুঙ্গির গিঁট কষতে কষতে একটা সময় বলে বসল, 'ছাড়েন তো দামের কতা! ও ডাবের মূল্য আপনি দিবেন কী করতে! তবে এইটে জেনে নেন ওসব ছেলেখেলা বেশি বাড়তে দিবেন না। ওটা একটা জন্মচোর! মায়াদয়ায় ওদের মঙ্গল হবার না।'

বলেই পিছন মুড়ে হাঁটা ধৰল জগা কুণ্ডু। একটা মুচকি হাসি হেসে পিছন ঘুরে বাড়িমুখো হল মোহনও।

কুণ্ডুর ভাবঝাড় থেকে সেই যে ছুট দিয়েছিল হাবা তা এ ইতি হল জলকলের আখড়ায় কে কোঁদানো মাটির স্তূপের ডগায় এসে। ছোটার মধ্যেই ও মাথার চোট ভুলে বসেছে। ওর হাঁকপাঁক এখন শুধু সাহেবকে ভাব ধরানোর জন্য। তাই সেই দেখল সাহেবকে অমনি গলা ঘুটল, 'সেলাম সাহেব! সেলাম!'

ডেভলিন লম্বা পা ফেলে ফেলে এগিয়ে এসে ডাব নিয়ে বলল, 'থ্যাঙ্কস।'

তারপর পকেট থেকে একটা চকচকে আধুলি বার করে হাবার হাতে দিল। দিয়ে হাবার চোখে চোখ রেখে শুধোল, 'O.K.?'

হাবা ছাই কী বুঝল হাবাও জানেনা। তবে ছোট্ট আওয়াজটা ওর কানে বসেছে। আর সাহেব ওই আওয়াজে কিছু জিজ্ঞেস করল ভেবে সাহেবের কথাটাই সাহেবকে ফিরিয়ে দিল। বলল, 'ওকে!'

বলেই দৌড়। আধুলি জুটল যখন, তখন আরেকবার পদ্মঝিলে গিয়ে বসার টান হল।

ও চলে যেতে দাড়িওলা শিখ এসে সাহেবকে বলল, 'স্যার, ডাবটা কি কেটে দোব?'

ডেভলিন স্মিত মুখে ডাবটা ধরিয়ে দিল সর্দারকে। হাবা ওর হাতের আধুলিটা টোকা মেরে হাওয়ার ছুড়ে ফের খপ্ করে তালুবন্দি করতে করতে পদ্মপুকুরে এসে পড়ল। একবার মাথার পিছনটা ছুঁয়ে দেখল, বেশ চিনচিন করছে। আর হাতটা সামনে এনে দেখল তাতে রক্ত লেগেছে।

ব্যোমযানের ভেতরে বসে বসে হাবার এই দৃশ্যটা দেখতে পেল অবতার।

অবতার ব্যোমযানের গোল জানলায় বসে। হাবাকে দেখে তার চোখের রঙ হল সবুজ।

অবতার হাবার মাথার রক্ত দেখল কাছে টেনে আনা দৃশ্যে। হাবার মাথার ক্ষতটাও গোচরে এল যেই পুকুরপাড়ে হাঁটু মুড়ে হাতের রক্ত ধুতে বসল হাবা।

আস্তে আস্তে অবতারের চোখের সবুজ আলো স্তিমিত হল। ও খুব চিন্তায় মগ্ন হতে ওর মাথাটা নুইয়ে পড়ল ধীরে। তারপর হঠাৎ কোত্থেকে এত দুড়ুম দুড়ুম আওয়াজে ওর চটকা ভাঙল। আওয়াজটা ঝটিতি ব্যোমযানের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে সেখানে একটা নতুন, জোরালো ধ্বনি-নকশা রচনা করল যান্ত্রিক পর্দায়। ধ্বনির ভর খাদের দিকেই, তবে তাতে একটা কাটা কাটা, তীক্ষ্ণ ছন্দ আছে।

আসলে জলমহলে যেন খোঁড়াখুড়ির কাজ চালু হয়ে গেছে, আর তার ভারী ধাক্কা, ওঠাপড়ার ছন্দ আপন হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে গেরামের হেথা হোথা, ইখানে উখানে, চারপাশে, সর্বত্র।

গ্রামের হৃদ্‌পিণ্ড যেন সাহেবের নবকল। (ক্রমশ)

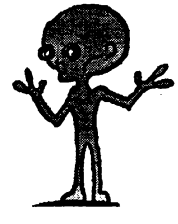

মিলটনগঞ্জের শিলটন সাহেব

রাহুল মজুমদার

ট্রেন থেকে নেমেই ভালো লেগে গেল জায়গাটা। বিনয় ঠিকই বলেছিল। ছোট্ট একফালি প্ল্যাটফরম-সর্বস্ব স্টেশনের গা ঘেঁষেই উঠে গেছে সবুজ টিলা, স্টেশনকে ঘিরে শাল পিয়াল মহুয়ার জঙ্গল। এই শীতে সকাল ন-টাতেও কুয়াশার মাফলার জড়ানো তার গায়ে। সমস্ত জায়গাটা জুড়ে এক আশ্চর্য আলস্য বিছিয়ে রয়েছে। উলের টুপিটা টেনে নামিয়ে কানটা ঢেকে নিলাম, তারপর পা বাড়ালাম বাইরের দিকে। সেখানে একটা টাঙ্গা দাঁড়িয়ে রয়েছে। বোধহয় মিলটনগঞ্জের একমাত্র টাঙ্গা। যাত্রী দেখেও টাঙ্গাওলার কোনো ব্যস্ততা চোখে পড়ল না, শুধু জিজ্ঞাসু চোখ তুলে তাকালো। কাছে গিয়ে বললাম, 'টেরি সাহেবের বাংলো চেনো?'

টাঙ্গাওলা একগাল হেসে বলল, 'হাঁ বাবু, দশ টাকা লাগবে।'

মনটা এত খুশি ছিল যে দরদাম করলাম না। টাঙ্গাওলাই আমার সুটকেসটা তুলে দিল টাঙ্গায়।

আমি বসতেই ও ঘোড়াকে বলল, 'চল ধন্নো।'

'ধন্নো!' আমি বিস্মিত হলাম।

'হাঁ বাবু, ধন্নো।' টাঙ্গাওলার জবাব, 'বাবু শোলে দেখেননি? বসন্তীর ঘোড়ির নাম তো ধন্নোই ছিল।'

'এ কী সেই ধন্নো নাকি?' আমার কৌতূহলী প্রশ্ন শুনে টাঙ্গাওলা হেসে বলল, 'না বাবু, শোলে ফিলিম দেখে আমার ঘোড়ির এই নাম রেখেছি। বঢ়িয়া নাম, না রে ধন্নো?'

ধন্নো নাক দিয়ে ফর্‌র্‌র্‌ শব্দ করে বোধহয় সমর্থন জানালো।

'বাবু, পুরা মিলটনগঞ্জে ধন্নো-বীরুকে সবাই চিনে।'

'তোমরা নাম বুঝি বীরু?' হেসে ফেললাম আমি।

'হাঁ বাবু, বীরেন মাহাতো।'

আমার বেশ ভালো লেগে গেল বীরেন ওরফে বীরুকে।

সহজ গতিতে পিচ রাস্তা ধরে চলেছে টাঙ্গা। দু-পাশের গাছপালার ফাঁক দিয়ে সকালের মিঠে রোদ মাঝেমধ্যে এসে আদরের হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। পাখিদের মিষ্টি ডাক ছাড়া শব্দ বলতে ঘোড়ার খুরের খটখট আর তার গলায় বাঁধা ঘন্টির ঝুমঝুম।

একটা জায়গায় এসে হঠাৎ ডানদিকে পড়ল খোলা ঢেউ খেলানো প্রান্তর। একটা মেঠো পথ একটু এঁকেবেঁকে একটা টিলাকে বেড় দিয়ে কোথায় যেন চলে গেছে। বীরুর টাঙ্গা সেই পথে নেমে পড়ল। টিলাটাকে বেড় দিতেই চোখে পড়ল গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে দু-চারটে বাড়িঘর। সবগুলোই প্রায় পুরনো আমলের বাংলো। এরকমই এক বাংলোর সামনে এসে থামল টাঙ্গা। বীরু হাঁক দিল, 'বুধন হো বুধন।'

বাংলোর পাশ থেকে বেরিয়ে এলো একজন। পরনে প্যান্ট শার্ট, গায়ে চাদর। এসেই একটা নমস্কার ঠুকল।

টাঙ্গা থেকে নেমে বললাম, 'তোমার বাবুর বন্ধু আমি, ক-দিন থাকব এখানে।' বুধন তার ঝকঝকে সাদা দাঁত মেলে হাসল, বলল, 'জানি বাবু।' তারপর টাঙ্গা থেকে সুটকেসটা নামিয়ে নিল। বাংলোর দিকে এগোতে এগোতে বলল, 'আপনি এই রোদে আরাম করুন, আমি চা লিয়ে আসছি।' তারপর গলা তুলে বীরুকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'এ বীরু, চা খেয়ে যাস।'

ইংরেজ আমলের বাংলো, কাঠ-পাথরে তৈরি। সামনে অনেকটা খোলা জায়গা। সেখানে মরসুমী ফুলের বাগান। বেশ কয়েক বড় গাছও রয়েছে। পাখিরা নির্ভয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে, জমি থেকে খুঁটে খাচ্ছে। উঠোনে একটা বেতের টেবিল আর গোটা তিনেক চেয়ার পাতা ছিল। তারই একটায় গা এলিয়ে বসলাম। বীরু বুধনের সঙ্গে বোধহয় রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই টী-পটে করে চা, আলাদা দুধ আর চিনি ট্রেতে সাজিয়ে নিয়ে এলো বুধন। ওর পিছনে বীরু, হাতে একটা প্লেটে ডবল ডিমের ওমলেট।

বিনয় অবশ্য বলেছিল, বুধনরা বংশ পরম্পরায় এই বাড়ির কেয়ার টেকার। এই বাংলোর বয়েস প্রায় একশো বছর। সাহেবরা দেশ ছেড়ে চলে যাবার সময় বিনয়ের ঠাকুরদা এই বাড়িটা প্রায় জলের দরে কিনে নেন। আগে বছরে দু-বার ওঁরা আসতেন এখানে। তারপর যা হয়, ধীরে ধীরে আসা কমে গেল। এখন দু-তিন বছরে হয়তো একবার আসে বিনয়রা, আর আসে তার আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব, ছুটি কাটাতে। যেমন আমি এসেছি।

বীরু টাকা নিয়ে চলে গেল। আমি বুধনকে নিয়ে বাংলোয় পা রাখলাম। তিনধাপ কাঠের সিঁড়ি পেরিয়ে চওড়া বারান্দা। তারপর বিশাল উঁচু কাঠের দরজার ওপারে বিশাল এক হলঘর। একসেট সোফা, সেন্টার টেবিল ছাড়াও গোটা ছয়েক পুরোনো আমলের চেয়ার।

একপাশে ফায়ার প্লেসের ম্যান্টলপিসের ওপর টাঙানো একটা পুরনো আমলের অয়েল পেন্টিং। বিদেশী ল্যান্ডস্কেপ। হলের দু-পাশে দু-টো বেডরুম, বাঁদিকের কোণা ঘেঁষে আরেকটা ঘর—স্টাডি। সদর দরজার উল্টোদিকে আরেকটা দরজা। ইংরাজি L অক্ষরের মতো টানা ঢাকা বারান্দা ধরে সারি সারি ঘর। কোনোটা রান্নাঘর, কোনোটা সারভেন্টস্ কোয়ার্টার, কোনোটা স্টোররুম। পিছনে সবজিবাগান আর কুয়োতলা।

বুধন আমার ব্যবস্থা করেছিল বাঁদিকের বেডরুমে। বিশাল ঘর। চারজনে শুতে পারে এমন খাট—পালঙ্ক বলাই ভালো। ড্রেসিং টেবিল, রাইটিং টেবিল, বেডসাইড টেবিল, আকাশছোঁয়া সিলিং, দেয়ালজোড়া আলমারি, লাগোয়া বাথরুম, তাতে কমোড, বাথটব—এলাহি ব্যবস্থা। বড় বড় দুটো পরদাসরানো জানালা আর গোল স্কাইলাইট দিয়ে আলো ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এখানে অন্তত একটা সপ্তাহ থাকতেই হবে।

দুপুরে বুধনের দেওয়া গরম জলে স্নান করে, তার রান্না ডাল, ভাত, আলুভাজা, ফুলকপির তরকারি, ডিমের ডালনা আর চাটনি দিয়ে পেটপুরে খেয়ে বিছানায় গা এলাতেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম। কলকাতার হই হট্টগোল ধুলোধোঁয়া যেন স্বপ্ন মনে হতে লাগল।

ঘুম ভাঙল বুধনের ডাকে। টেবিলের ওপর চায়ের সরঞ্জাম আর পরোটা আলুভাজা। আশ্চর্য হয়ে অনুভব করলাম দিব্যি খিদেও পেয়েছে। সূর্য তখন পশ্চিমে হেলেছে। জায়গাটাকে পায়ে হেঁটে দেখব বলে সোয়েটারটা গলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বুধন বলল তাড়াতাড়ি ফিরতে, কারণ এখানে অন্ধকার তাড়াতাড়ি নামে আর ইলেকট্রিসিটি না থাকায় রাস্তাঘাটে আলো নেই।

বাড়ির সামনের পথটা ধরেই চললাম। বাড়িগুলো বেশ দূরে দূরে। প্রায় সবকটাই তালাবন্ধ। বেশ খানিকটা যাবার পর খানিকটা খোলা জায়গা চোখে পড়ল—দু-চারটে গরু চরছে। একটু দূরে জঙ্গল মতো। সেখানে একটা গির্জার চুড়ো দেখা গেল। কৌতূহল হল। পা বাড়ালাম। কাছে গিয়ে বুঝতে অসুবিধে হল না, গির্জাটা পরিত্যক্ত। চারদিকে ঝোপজঙ্গল গজিয়ে গেছে। দু-হাতে সেগুলো সরিয়ে একেবারে গির্জার সামনে গিয়ে পড়লাম। গির্জার সারাগায়ে কালের ছাপ। দেয়ালের পলেস্তারা খসে পড়ে ভেতরের পাথরগুলো কালচে দাঁত মেলে অসন্তোষ জানাচ্ছে। দরজা জানালার জায়গায় কালো গহ্বর। গা-টা কেমন শিরশির করে উঠল। হঠাৎ কেমন অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। মনে হতে লাগল, কে যেন আমার ওপর নজর রাখছে, যদিও এদিকে ওদি তাকিয়ে কাউকেই দেখতে পেলাম না। আলো যে হঠাৎই খুব কমে এল। এখানে জঙ্গলটা বেশ ঘন, তা জন্যও হতে পারে। আমি আর দাঁড়ালাম না, জোরে চালিয়ে ফেরার পথ ধরলাম। বাড়িতে ফিরতে ফিরতে অন্ধকার নেমে এলো। বুধন একটা টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে একটু ধমকের সুরেই যেন বলল, 'এত দেরি করবেন না বাবু।'

ঘরে আলো দিয়ে গেছে বুধন। আর আরেক দফা চ সঙ্গে গরম পেঁয়াজি। আমি সঙ্গে আনা বইগুলোর একটা খুলে বসলাম। আশ্চর্য! মন থেকে কিছুতেই ওই গির্জাটাকে মুছে ফেলতে পারছি না। নতুন অচেনা পরিবেশ, অমন জঙ্গুলে পরিবেশে পরিত্যক্ত ভাঙাচোরা গির্জা এটা অস্বস্তিকর ছাপ ফেলেছে আমার মনে। রাত্রে মুরগির ঝোল দিয়ে গরম গরম রুটি খেতে খেতে অবশ্য সেই ছাপ অনেকটাই মুছে গেল। রাত্রে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোলামও দিব্যি।

ঘুম ভাঙল পাখি আর বুধনের ডাকে। বেড টী নিয়ে এসেছে। ওঃ, এত আরামও জীবনে আছে! সকালের জলখাবার খেয়ে বাইরে রোদ্দুরে বসেছি, বীরু তার টাঙ্গা নিয়ে হাজির। বলল, 'বাবু, একটু দূরে একটা সুন্দর ঝরনা আছে, দেখবেন?'

ভাবলাম, বসে থেকেই বা কী করব, ঘুরেই আসি। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কত দূর? কতক্ষণ লাগবে?' বীরু জবাব দিল, 'তা বাবু পাঁচ-ছ কিলোমিটার হবে। দুপুরের আগেই ফিরে আসবেন।'

বুধনকে বলে চেপে বসলাম টাঙ্গায়। টাঙ্গা চলতে শুরু করল। বীরুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, এখানে কি কেউ থাকে না?'

'না বাবু', ও জবাব দিল, 'এদিককার বাড়িগুলো ফাঁকাই থাকে বছরের বেশির ভাগ সময়। মিলটনগঞ্জ বাজার এখান থেকে দু-কিলোমিটার দূরে। ওইখানে কিছু লোকজনের বাস আছে। চারদিকে এত পাহাড়, ঝরনা—এখানে কত ভালো টুরিস স্পট হতে পারে। কারো কোনো নজরই নেই।' ওর সঙ্গে একমত হলাম আমি। টাঙ্গা চলতে চলতে সেই ফাঁকা জায়গাটায় পৌঁছল। চোখে পড়ল গির্জার চূড়োটা। ওটাকে দেখিয়ে বললাম, 'গির্জাটার এরকম দশা কেন? কেউ দেখাশুনো করে না?'

'কে করবে বাবু? সায়েবরা তো সব ভেগে গেল। যে কটা ছিল, মরে হেজে গেছে। দু-একটা বুড়ো হাবড়া এখনও অবশ্য চোখে পড়ে বাজারে। কী তাদের দেমাক এখনও।' বীরুর অশ্রদ্ধ জবাব।

আরো কিছুক্ষণ চলার পর গাছপালার মাঝে বেশ কিছু বাড়িঘর চোখে পড়ল। বুঝলাম ওটাই মিলটনগঞ্জ বাজার। নেহাৎই গেঁয়ো বাজার—মাটিতে বসে তরিতরকারি বিক্রি করছে কিছু লোক। তাদের ঘিরে কিছু লোকজন। দোকান বলতে একটা মুদিখানা, একটা সাইকেল সারাবার দোকান আর একটা চায়ের দোকান। সবই মাটির বাড়ি খড়ের চালা। আশেপাশের বাড়িগুলোও তাই। শুধু দু-তিনটে পাকাবাড়ি চোখে পড়ল। চায়ের দোকানটাই যা জমজমাট। সমস্ত জায়গা জুড়ে আলস্য বিছানো। কারও কোনো তাড়া আছে মনে হয় না। টাঙ্গা দেখে কয়েক জন হাসল, হাত নাড়ল। বীরু না ধন্নো, কার উদ্দেশ্যে কে জানে! এবার পুরো জঙ্গল। শাল, মহুয়া, কেঁদ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে রোদ মাখছে। আরও আধ ঘন্টাটা চলার পর জলের শব্দ কানে এলো। ধীরে ধীরে সে শব্দ বাড়ল। মিনিট দশেক পরে দাঁড়িয়ে পড়ল টাঙ্গা। বীরু বলল, 'এবার বাবু টুকুস হাঁটতে হবে। চার-পাঁচ মিনিট' হাঁটার পর পৌঁছে গেলাম ঝরনার সামনে। জলপ্রপাত নয়, নেহাৎই ঝরনা—কিন্তু কী তার সৌন্দর্য! ধাপে ধাপে যেন নাচতে নাচতে নেমে আসছে। নীচে একটা কুণ্ড মতো তৈরি হয়েছে। তার একপাশ দিয়ে একটা জলধারা বেরিয়ে হারিয়ে গেছে বনের মধ্যে। গাছপালা ভেদ করে সূর্যের কিরণ তেরছা হয়ে জলের ওপর যেখানে যেখানে পড়েছে, সেখানে হাজার হীরের ঝকমকি। আফশোস হলো ক্যামেরা আনিনি বলে। কতক্ষণ বসেছিলাম, জানি না। বীরু বলল, 'চলুন সাব। এবার ফিরতে হবে। দেরি হলে বুধন আমার জান খেয়ে লিবে।'

ফেরার পথে ওই গির্জাটায় যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করতেই হাঁ হাঁ করে উঠল বীরু, 'আরে না না সাব। ওখানে যাবেন না। ওর পিছে সব সায়েব মেমদের কবর আছে। সব ভূত হয়ে ওখানে ঘুরে ফিরে। গেলেই একদম....' বাক্য শেষ করল না বীরু, টাঙ্গার স্পীড বাড়িয়ে দিল।

বিকেল হতেই আমার মনটা কেমন ছটফট করতে থাকল। গির্জাটা যেন আমাকে চুম্বকের মতো টানতে লাগল। বিকেলের জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বেরোবার সময় টর্চটা পকেটে ঢুকিয়ে নিলাম। গির্জার কাছে পৌঁছে ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে চলে এলাম পিছন দিকটায়। এখনো দিনের আলো আছে, ফলে কবরগুলো দেখতে অসুবিধে হল না। প্রায় সবগুলোই ভেঙেচুরে গেছে, দু-একটার ফলক অবশ্য এখনও কোনোরকমে খাড়া আছে। দেখেই বোঝা যায় বহুদিন এদিকে কেউ আসে না। এখানে রাত্রে যদি শেয়াল কুকুরও ঘোরাফেরা করে, লোকের মনে হতেই পারে ভূতের কথা। আমার মনে হলো, একটু সাফসুতরো করতে পারলেই, এ জায়গাটা বেশ একটা দর্শনীয় স্থান হতে পারে। একশো দেড়শো বছরের পুরোনো গির্জা আর কবরখানা মানুষকে আকর্ষণ করবেই।

কতক্ষণ এরকম চিন্তা করেছি, বলতে পারব না। অন্ধকার ঘিরে ধরায় সম্বিত ফিরল। ফেরার পথ ধরলাম। মনে মনে ঠিক করলাম, দিনের বেলা এসে যে নামধামগুলো উদ্ধার করা যায়, টুকে নিয়ে যাব। কোনো

কাগজে টাগজে মিলটনগঞ্জ নিয়ে লিখতে পারলে এত সুন্দর জায়গাটার প্রচার হবে। ভাবতে ভাবতে গির্জার পাশ দিয়ে আসবার সময় একজনের সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে বেঁচে গেলাম। এই সময় এইখানে কেউ আসতে পারে, একথা কল্পনাও করিনি, ফলে বুকটা ধ্বক করে উঠল। মুখ তুলে দেখি একজন অতিবৃদ্ধ মানুষ, কোটপ্যান্টপরা, টুপিটা হাতে ধরা। এই আধো অন্ধকারেও বুঝতে অসুবিধে হলো না, মানুষটা অত্যন্ত ফরসা। সম্ভবত এখানকার মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকা দু-একজন সাহেবের একজন।

সাহেব একটু ঝুঁকে বাও করে কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'গুড ইভনিং ইয়ংম্যান।'

আমার যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে এলো। প্রত্যাভিবাদন করে বললাম, 'গুড ইভনিং স্যার।'

—'তোমাকে এখানে নতুন দেখছি। চেঞ্জার?'

—'বলতে পারেন।'

—'কিন্তু, তুমি এই গ্রেভইয়ার্ডে কী করছ? ইটস্ নট আ নাইস প্লেস টু ভিজিট!'

—'পুরোনো জিনিসের, পুরোনো দিনের ওপর আমার একটা টান আছে। তাছাড়া, এর সঙ্গে অতীত যুগের ইতিহাস জড়িয়ে আছে।'

'ইয়েস মাই বয়। প্রায় দেড়শো বছরের ইতিহাস। মিলটনগঞ্জের ফাউন্ডার মিঃ মিলটন ম্যাকবয় থেকে শুরু করে কতজন শুয়ে আছে এখানে। আমারও তো প্রায় সকলেই এখানে। মা, বাবা, ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, কাকারা, এক মামা, আমার দুই ভাই—আমাদের প্রায় গোটা পরিবারই এইখানে—'একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সাহেব। তারপর বললেন, 'মাই বয়, ইউ বেটার গো ব্যাক নাউ। এই অন্ধকারে অনেকরকম বিপদ আছে। তোমার পক্ষে এখানে থাকা উচিত হবে না।'

'আর, আপনি?' আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল প্রশ্নটা।

'আমি?' সাহেব বোধহয় হাসলেন, 'অনেকদিন ধরে আছি তো, এভরিবডি নোজ মি হিয়ার। দে ওন্ট হার্ম মি। আমি এখন আমার আপনজনদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করব।' তারপর হঠাৎই যেন মনে পড়ল, সেভাবে বললেন, 'ও ডিয়ার। আই হ্যাভ্ন্ট ইন্ট্রোডিউস্ড মাইসেলফ। তোমার নামও জানা হয়নি। ওয়েল, আয়াম পিটার শিলটন।'

আমিও পরিচয় দিলাম।

সাহেব বিদায় জানিয়ে ঢুকে পড়লেন কবরখানায়। আমি টর্চ জ্বালিয়ে ফেরার পথ ধরলাম। রাতে শোবার সময় মনে হল, যাঃ, ভারি ভুল হয়ে গেছে। সাহেবের ঠিকানা নেওয়া হয়নি। যাক্‌গে। আগামীকাল বাজারে গিয়ে খোঁজ করলেই হবে। বীরু তো বলেছে, যে দু-চারজন সাহেব রয়েছেন, তাঁরা ওখানেই থাকেন।

পরদিন সকালের জলখাবার খেয়েই ঝোলায় খাতা কলম ভরে বেরিয়ে পড়লাম গির্জার উদ্দেশে। দিনের আলোয় জায়গাটাকে একটুও ভয়ানক মনে হলো না। কবরখানাটাও বেশ নিরীহ মনে হলো। আমি নাম আর তারিখ লেখা ফলকের টুকরো খুঁজতে লাগলাম। প্রথমেই যেটা পেলাম, সেটা ভাঙা।...wyk—8 March 1898 টুকুই শুধু পড়া যাচ্ছে। এরপর একজন John B. Charlesworth, একজন Julie Smith, একজন Roger P. Mecoy (ইনি সম্ভবত মিলটন ম্যাককয়ের বংশধর) এরকম বেশ কিছু ফলক বা তার টুকরো পেলাম। সবথেকে পুরোনোটা 1839 সালের। ওয়েদারবীও পেলাম গোটা তিনেক। তাঁরা সব মারা গেছেন 1853 থেকে 1943-র মধ্যে। যে ক-টা কবরের ফলক এখনো দাঁড়িয়ে আছে, তারই একটার গায়ে মনে হলো মিঃ শিলটন দাঁড়িয়ে আছেন। ওটাও তাহলে ওনার কোনো পরলোকগত আত্মীয়ের কবর। ওদিকটায় ঝোপঝাড় বেশি ঠাসা। পথ করে যেতে বেশ কষ্ট হলো। কাছে পৌঁছে কিন্তু মিঃ শিলটনকে দেখতে পেলাম না। চলে গেলেন নাকি!

যা হোক, কবরের ফলকের লেখাটা পড়লাম—

Peter S. Shilton rests here
15.06.1884—28.11.1946.

আমি জীবনে এতজোরে এতখানি কখনও ছুটিনি।

ছবি: লেখক

রাকা দাশগুপ্ত

সাউথ পার্ক স্ট্রীট গোরস্থানটায় ঢুকলেই কেমন একটা গা ছমছম করা অনুভূতি হয়। সেটাকে ভূতের ভয় বলা যায় কিনা, জানে না অরুণাভ।

সম্ভবত ভয় নয়। কিন্তু এই যে গাছগাছলির মাঝখানে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে উঁচু উঁচু সব সমাধিস্তম্ভ, তাদের দীর্ঘ ছায়ায় ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে দুপুরের রোদ্দুর, চারপাশে একটা অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা—এই সবকিছুর মধ্যেই কোথাও যেন ছমছমে, থমথমে ভাবটা মিশে রয়েছে।

নাহ, ভূতের গল্পের পটভূমি হিসেবে এর চেয়ে উপযুক্ত জায়গা আর কিছু হতে পারে না। পরিবেশটাকে কাজে লাগিয়েই এবার দ্রুত একটা ভূতের গল্প লিখে ফেলতে হবে অরুণাভকে। আর দেরি করা চলবে না।

ওর কয়েকজন বন্ধু—অনুপম, শ্রাবণী আর সৈকত অনেকদিন ধরে প্ল্যান করছিল, ভূত এবং ভূতের গল্প নিয়ে একটা পত্রিকা নিয়মিতভাবে বের করবে। নামও ঠিক হয়ে গিয়েছিল ম্যাগাজিনটার—'ভূতুড়ে'। এ ব্যাপারে অরুণাভর নিজের খুব একটা উৎসাহ ছিল না আগে। তবে কথা দিয়েছিল, ভূতুড়ের প্রথম সংখ্যার জন্য একটা জমাটি ভূতের গল্প লিখে দেবে।

সেই লেখা নিয়েও বসা হয় নি এতকাল। আসলে "প্রজন্ম" পত্রিকায় ওর যে ধারাবাহিক উপন্যাসটা বেরোচ্ছিল, সেটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত একদম ফুরসতই পাচ্ছিল না অরুণাভ। এখন অবশ্য ও অনেকটাই ফ্রি। তাছারা সৈকতরা চেষ্টা করছে যাতে আগামী বইমেলার আগেই ভূতুড়ের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করা যায়। কাজেই এবার ভূতের গল্পটা শুরু না করলেই নয়।

ভূতুড়ে গল্প লেখার কাজটা যত অনায়াসে হবে ভেবেছিল অরুণাভ, কার্যকালে দেখা যাচ্ছে ব্যাপারটা তত সহজ নয়। যাই লিখতে যায়, মনে হয় এ প্লট তো পুরনো! সবই সেই পোড়োবাড়ি কিম্বা পরিত্যক্ত জমিদারবাড়ির গল্প, কিম্বা রাতের ভৌতিক ট্রেন বা বাসের বিভীষিকা, অপঘাতে মৃত কারো আত্মার ফিরে আসা, প্রতিশোধ। এই ছকের বাইরে বেরিয়ে কিছু লেখা যায় কি?

তা অরুণাভ আজকাল ভূত খুঁজতে শুরু করেছে। সত্যি ভূত, মিথ্যে ভূত— যা হোক একটা ভূত চাই তার। একটু নতুন ধরণের ভূত, যাকে নিয়ে বেশ আনকোরা একটা গল্প লেখা যাবে।

লীলা মজুমদার লিখেছিলেন, 'কলকাতার পথেঘাটে ট্রামে বাসে যে এত অসম্ভব বেশি লোক, তাদের সকলেই সত্যিকার মানুষ কিনা, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।' অরুণাভ তাই কয়েকদিন রাস্তাঘাটে, ভিড় বাসে ঘোরাঘুরি করেছে স্রেফ এই আশায়, যদি কোথাও একটা ইন্টারেস্টিং ভূত খুঁজে পাওয়া যায়। খাঁটি প্রেতাত্মা যদি নাও মেলে, নিদেনপক্ষে কি একটা মানুষ জুটবে না, যাকে দেখলেই বেশ একটা ভূত-ভূত ব্যাপার অনুভূত হয়? তেমন কাউকে পেলেও তো কিছুটা কল্পনার মিশেল দিয়ে একটা গল্প খাড়া করে নিতে পারত অরুনাভ। কিন্তু কোথায় কি? কলকাতা শহরটা অস্বাভাবিক রকমের ভূতশূন্য হয়ে গেছে।

অগত্যা মেষমেশ এই গোরস্থানে।

এই জায়গাটায় এলে মনে হয়, একটা অদ্ভুত নগর যেন। সারি সারি সমাধি, সংখ্যায় বোধহয় হাজারের কাছাকাছি হবে। কোনওটা চৌকোণা থামের মত, কোনওটা গম্বুজ আকৃতির, কোনওটা আবার ছোট্ট বাড়ির আকারের। মাটির নিচে চিরঘুমে ঘুমিয়ে আছে দেড়শো-দুশো বছর আগেকার মানুষেরা।

অরুণাভ কাঁধের শান্তিনিকেতনী ব্যাগটা থেকে একটা নোটবুক আর পেন বার করল। সামনে একটা সমাধিফলক, ১৭৯৩ সালে প্রয়াতা লিসা অ্যান্ডারসনের প্রতি স্মৃতিতর্পণ করে গেছেন তাঁর স্বামী। সংক্ষেপে সন-তারিখ গুলো টুকে নিল ও। ভূতের গল্পে এগুলো ব্যবহার করা যাবে কি? না কি সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত তথ্যভারাক্রান্ত হয়ে যাবে লেখাটা?

যাই হোক, পটভূমি পাওয়া গেল, এবার একটা ভূত মিললেই হয়।

আশেপাশের অধিকাংশ সমাধিই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিভিন্ন রেজিমেন্টের সৈন্যদের। মার্বেল ফলকে লেখা জন্ম-মৃত্যুর বিবরণ থেকে দেখা যাচ্ছে তাদের অনেকেই মারা গেছেন নিতান্তই তরুণ বয়সে। এদের কাউকে নায়ক করে লেখা যায় কি গল্পটা? রয়্যাল আর্টিলারির লেফটেন্যান্ট ডড কিম্বা বেঙ্গল ইনফ্যান্ট্রির ক্যাপ্টেন ফেরারব্যাঙ্ক?

কিম্বা মহিলাদের কাউকে নিয়েই লিখবে নাকি? মন্দ হয় না কিন্তু! অরুণাভর ডানপাশে চতুষ্কোন থামের আকারে যে ওবেলিস্কটি চওড়া থেকে ক্রমশ সরু হয়ে ওপরে উঠে গেছে, সেটাই তো অষ্টাদশ শতকের কোনও এক ব্রিটিশকন্যার। তার পাশেরটাও। এঁরা কেউ ভূত হয়ে ফিরে আসতে পারেন না?

কিন্তু সে ভূতের উদয় হবে কোথায়? এই কবরখানায়? কলকাতার রাস্তায়? ভরদুপুরে কলকাতায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সাহেব বা মেমসাহের ভূত, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ঠেকবে?

নাহ্, অন্যভাবে ফাঁদতে হবে গল্পটা।

হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দ। অরুণাভ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। সরু রাস্তাটা দিয়ে হেঁটে আসছে একটি শ্বেতাঙ্গিনী মেয়ে, একা। জলপাইরঙা কার্গো প্যান্টের ওপর সাদা ঢিলেঢালা টি শার্ট, চোখে রোদচশমা, মাথার সোনালী চুল পনি টেইলে বাঁধা।

অরুণাভ একদৃষ্ট তাকিয়ে রইল। মেয়েটি বিদেশিনী, নিঃসন্দেহে। ভূত হতে পারে কি এ? কিছু না হোক, একে নিয়েই একটা ভূতের গল্প লিখে ফেলা কি যাবে না? মেয়েটির পোষাক পরিচ্ছদ সবই আধুনিক, কিন্তু মুখশ্রীর মধ্যে দুশো বছর আগেকার কোনও এক ইংরেজদুহিতার আদল কল্পনা করে নেওয়া তো খুব শক্ত নয়! তাহলে কি যা খুঁজছিল, তাই পেয়ে গেল অরুণাভ?

মেয়েটি ততক্ষণে সামনে চলে এসেছে। হাতে একটা ক্যামেরা। অরুণাভকে দেখে মিষ্টি করে হাসল— 'হাই'।

'কবরখানা দেখতে এসেছেন?' অরুণাভ আড়ষ্ট ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করল। রোদ্দুর তো তেমন কড়া নয়, মেয়েটা তাও সানগ্লাস পরে আছে কেন? কি দেখা যাবে চশমা খুললে? স্থির মার্বেলের মত চোখ? হাড় হিম করা চাউনি?

'হ্যাঁ, কবরখানা দেখতেই। আপনি কলকাতাতেই থাকেন? দিস ইজ অ্যানা, ফ্রম আয়ারল্যান্ড।

অ্যানা! এই নামটা কোনও সমাধিপ্রস্তরে লেখা ছিল কি? ঠিক মনে করতে পারল না অরুণাভ।

তবে ওর কল্পনাবিলাসী মন উত্তেজিত হয়ে উঠল। মনশ্চক্ষে ও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল দুশো বছর আগেকার ইতিহাসকে। সময়টা আঠেরোশো সালের কাছাকাছি। তার কিছুদিন আগেই ব্রিটিশ ভারতের রাজধানীর তকমা পেয়েছে কলকাতা। ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে বসতি, ঘরবাড়ি, প্রশাসনিক ভবন। এই পার্ক স্ট্রীটই তখন শহরের প্রান্তসীমায় অবস্থিত বেরিয়াল গ্রাউন্ড রোড। আশেপাশে তখনও জঙ্গল।

এই সময়ে কোনও এক ইংরেজ অফিসারের বাগদত্তা হয়ে ভারতবর্ষে পা রাখল আইরিশ অভিজাতবংশের এক তরুণী। অ্যানা।

তারপর? কলকাতার জলহাওয়ার পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে ওঠার আগেই হয়তো কোনও অসুখে পড়ল মেয়েটি। ম্যালেরিয়া কিম্বা কলেরায় অকালমৃত্যুর হার তো খুব বেশি ছিল তখন। অ্যানাও বাঁচল না। তার জায়গা হল এই সমাধিক্ষেত্রে।

আজ হয়তো দুই শতাব্দী পেরিয়ে এসে সেই মেয়েই মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে অরুণাভর। গায়ে রীতিমত কাঁটা দিয়ে উঠল ওর।

'আসলে শুনেছি আমাদের বংশের একজনের সমাধি আছে এখানে, কিছুটা সেই খোঁজেই এখানে আসা। কলকাতায় এসেছিলাম একটা অন্য কাজে, ভাবলাম এত কাছে যখন এসেছি, ঘুরেই যাই একবার এই গোরস্থান থেকে মেয়েটির কথায় সম্বিত ফিরে পেল অরুণাভ।

'তাই? খুঁজে পেয়েছেন সমাধিটা? কি নাম অপনাদের সেই পূর্বপুরুষের?'

'মেজর-জেনারেল চার্লস স্টুয়ার্ট। আমি অবশ্য সরাসরিভাবে ওঁর বংশধর নই, ওঁর এক খুড়তুতো ভাই ছিলেন আমার গ্রেট-গ্রেট-গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার বা ওরকম কিছু। কিন্তু চার্লস স্টুয়ার্ট খুব অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যে জন্য ওঁকে নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে আমাদের পরিবারে। সমাধিটা অবশ্য দেখতে পাই নি এখনও, আসলে আমি তো এই সবে ঢুকলাম এখানে।'

নাহ! তাহলে অরুণাভই ভুল করছিল? মেয়েটি কোনও অশরীরী তো নয়! স্রেফ একজন সাধারণ ট্যুরিস্ট, পরিবারের কারও সমাধি খুঁজতে এসেছে পার্ক স্ট্রীটে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? মেয়েটির চোখ-মুখ-বাচনভঙ্গী দেখে কে জানে কেন মনে হচ্ছে, এ যেন ঠিক রক্তমাংসের মানুষ নয়। কোন প্রাচীন আত্মা কি আসতে পারে না এক আধুনিক তরুণীর ছদ্মবেশে? চিন্তাগুলো অরুণাভর মাথার মধ্যে পাক খেতে থাকল।

তবে ও কিন্তু ভয় পাচ্ছিল না একটুও। আসলে মেয়েটির কথা বলার ভঙ্গীটা এত সুন্দর, হাসিটা এত মিষ্টি —ওর মনে হচ্ছিল, মেয়েটি যদি ভূতও হয়, অরুণাভর কোনও ক্ষতি করবে না সে। তাছাড়া ভূত মাত্রেই অনিষ্টকারী হবে, এমন তো কোনও যুক্তি নেই!

'চলুন, তাহলে আমিও খুঁজি ওই সমাধি।'— হাসবার চেষ্টা করল অরুণাভও, 'মেজর স্টুয়ার্টের অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের কথা কি বলছিলেন?'

দুজন মিলে কবরখানার অন্য দিকটায় এগিয়ে যেতে থাকে। অ্যানা বলতে থাকে—

'মেজর-জেনারেল চার্লস স্টুয়ার্ট ছিলেন খুব প্রতাপশালী মানুষ। যেটা খুব ইন্টারেস্টিং, সেটা হল— এদেশে এসে উনি ভারতীয় জীবনধারা, সংস্কৃতির দ্বারা খুব প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। বিশেষ করে হিন্দুধর্ম, হিন্দু দেবদেবী এসব নিয়ে ওঁর প্রচন্ড আগ্রহ ছিল।'

'তাই?'

'হ্যাঁ, সে জন্য ওঁর একটা নামও চালু হয়ে গিয়েছিল— হিন্দু স্টুয়ার্ট। গঙ্গা তো আপনাদের কাছে খুব পবিত্র নদী, তাই না? জানেন, মেজর স্টুয়ার্ট রোজ সকালে উঠে গঙ্গাস্নানে যেতেন। পান খেতেন, ভারতীয় পোষাক পরতেন। মানুষ হিসেবেও বড় ভাল ছিলেন।'

এমন একটা আন্তরিকতার সুর নিয়ে কথাগুলো বলছিল অ্যানা, তাতে অরুণাভ আরও নিঃসংশয় হচ্ছিল —মেয়েটি মেজর স্টুয়ার্টেরই ঘনিষ্ঠ কেউ না হয়ে যায় না! কল্পনার রাশ আবার আলগা করে দিল ও—কে জানে, অ্যানা হয়তো ছিল চার্লস স্টুয়ার্টের কোনও বান্ধবী, কিম্বা নিকটাত্মীয়া। হয়তো সে ভারতে আসেই নি কোনদিন। চার্লস নিশ্চয়ই মাঝে মাঝেই দীর্ঘ চিঠি পাঠাতেন অ্যানার আয়ারল্যান্ডের ঠিকানায়—তাতে থাকত কলকাতার গোড়াপত্তনের কাহিনী, হিন্দু দেবদেবীদের গল্প, গঙ্গার ঘাটের ছবি। এই শহরে একবার বেড়াতে আসার জন্য অ্যানাকে পীড়াপীড়িও কি করতেন না সেই চিঠিতে? হয়তো অ্যানা সে অনুরোধ রাখতে পারে নি তখন। আজ প্রায় দুশো বছর পরে তাই তার আত্মা ছুটে এসেছে চার্লসের ভারতবর্ষকে দেখতে।

যাক, এই নিয়েই গল্পটা লিখে ফেলা যাবে, আর প্লট হাতড়ে বেড়াতে হবে না। বেশ নিশ্চিন্ত লাগছিল অরুণাভর—আজ রাতের মধ্যেই লেখাটা শেষ করে ফেলতে পারবে ও। 'ভূতুড়ে'র দপ্তরে পান্ডুলিপিটা পৌঁছে দিতে একটু সমস্যা হবে হয়তো, তবে সেটা পরে ভাবলেও চলবে। আগে তো লেখাটা হোক!

দুজনে একসাথে অনেকক্ষণ ঘুরল কবরখানায়। এত সমাধির ভিড়ে একটা বিশেষ সমাধি খুঁজে পাওয়াটা দেখা গেল সত্যিই বেশ কঠিন কাজ। তবে দুশো বছর আগেকার এক প্রেতাত্মার সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটছে, এটা ভাবতেই অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চ হচ্ছিল অরুণাভর।

শেষ পর্যন্ত অরুণাভরই চোখে পড়ল হিন্দু স্টুয়ার্টের সমাধিটা। ছিমছাম, সুন্দর স্মৃতিসৌধ, নকশায় কিছুটা ভারতীয় মন্দিরের আদল। চারধারে খিলান, দরজার মাথায় খোদাই করা পাথরের কারুকাজ। অ্যানাকে ডাকল ও— 'এই দেখুন, যেটা খুঁজছিলেন পাওয়া গেছে।'

অ্যানা ছেলেমানুষের মত খুশি হয়ে উঠল—'কই? কোথায়?'

'এই তো। সামনেরটাই।'

অ্যানা এগিয়ে এল, মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল সমাধিটার দিকে। আচ্ছন্ন গলায় বলল—'এখানেই তাহলে ঘুমিয়ে আছেন সেই চার্লস স্টুয়ার্ট! ভাবলেই কিরকম লাগছে, জানেন?' তারপর ধীর পায়ে কাছে এসে দাঁড়াল, কারুকার্যমন্ডিত দেওয়ালটার গায়ে হাত বোলাতে লাগল পরম মমতায়।

অ্যানাকে দেখতে দেখতে অরুণাভ ভাবছিল, কেউ যদি দুই শতাব্দী পর তার প্রিয়জনের সমাধির পাশে এসে দাঁড়ায়, তার এমন বিহ্বলতা আসাই তো স্বাভাবিক। কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করল ও—'আপনার অনেক আবেগ জড়িয়ে আছে এই সমাধির সঙ্গে, তাই না?'

'থাকবে না? মেজর-জেনারেল স্টুয়ার্টের গল্প তো কিংবদন্তীর মত হয়ে গেছে আমাদের পরিবারে—কত শুনেছি সেসব! ভারি আশ্চর্য মানুষ ছিলেন তো! এখানকার দেবদেবীদের মূর্তির একটা বিরাট কালেকশন বানিয়ে ফেলেছিলেন উনি, আপনাকে বলেছি কি? তার কিছু কিছু আবার ইংল্যান্ডেও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ওরকম একটা মূর্তি — লর্ড কৃষ্ণ—এখনও আছে আমার গ্র্যান্ডমা-র কাছে। সেই চার্লস স্টুয়ার্টের সমাধি এটা, ভাবলেই তো শিহরণ হচ্ছে আমার!'

অরুণাভর করুণাই হচ্ছিল। আহা, পূর্বপুরুষের স্মৃতি, পরিবারিক ইতিহাস, এমনি কত মিথ্যা দিয়ে মেয়েটাকে নিজের আসল পরিচয় ঢেকে রাখতে হচ্ছে। অবশ্য কি-

অমিতানন্দ দাশ

চুম্বক

ইনভেন্টর সূর্যশেখর বসুকে একটি আভারগ্রাউণ্ড ভল্টের পুরোনো লক পাল্টিয়ে সর্বাধুনিক ইলেকট্রনিক লক বসাবার ফরমাশ দিয়েছেন ভুটানের দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত নারায়ণকোটের রাজা বিক্রমনারায়ণ। যন্ত্রপাতি বানিয়ে রওনা হবার মুখেই আজানা শত্রুর হুমকি এল—'নারায়ণকোটে গেলে মরবে—যেও না'। ধমকানি অগ্রাহ্য করে সড়কপথে রওয়ানা হলেন সূর্যদা। সঙ্গী নিখিল ও তার বোন দিশা। পথে শত্রুর গাড়ি অনুসরণ করছে। ওদের রাত কাটল আলিপুরদুয়ারে, রাজারই গেস্ট হাউসে। পরদিন রাজার আলিপুরদুয়ার দপ্তরের ম্যানেজার ধূর্জটিবাবু আর বিশ্বস্ত রক্ষী লখীর সঙ্গে ওরা রওয়ানা হলেন। পাহাড়ি পথে ভুটান সীমান্তের কাছাকাছি একটা ছোট পাহাড়ের মাথায় কাছে ওঠার সময়ে শুনলেন এক শক্তিশালী বাইকের আওয়াজ। তারপর একটা বিকট শব্দ! তার পরে?

জোরে ব্রেক কষলেন ধুর্জটিবাবু—বললেন, 'বাইকটার অ্যাক্সিডেন্ট!' থামতেই টপাটপ লাফিয়ে নামলাম আমরা সবাই।

সূর্যদা বললেন, 'ধূর্জটিবাবু, এখানেই থাকুন—দিশাও দাঁড়া! নিখিল, লখী আর আমি এগিয়ে দেখি কি হয়েছে—' বুঝলাম সূর্যদার সন্দেহ—অ্যাক্সিডেন্ট নয়, অন্য কিছু! দুদিকে জঙ্গলে ঢাকা ঢালু জমি উঁচুতে উঠে গিয়েছে। আড়ালে লুকিয়ে অ্যাম্বুশ করার আদর্শ জায়গা। ধুর্জটিবাবু, সূর্যদা ও লখী—তিনজনেই আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে রয়েছেন—

দেখলাম রাস্তার বাঁয়ে, ঝোপঝাড়ের মধ্যে, একটা ঘষ্টানোর দাগ ঢুকে গিয়েছে। চাপা গোঙ্গানির শব্দ—কাছে গিয়ে দেখি ঝোপের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে জিন্‌স্ পরা দুটো পা। 'তোরা লোকটাকে সাবধানে তুলে রাস্তায় আন!' বলে সূর্যদা উপরের জঙ্গলের মধ্যে কি দেখে দুটো গুলি ছুঁড়লেন—ধূর্জটিবাবুর শক্তিশালী রাইফেলও গর্জে উঠল! জঙ্গলের মধ্যে দুদ্দাড় দৌড়ে পালানোর আওয়াজ।

ধূর্জটিবাবু, তবু চোখ রাখুন!' বললেন সূর্যদা।

'কী হলো?' চীৎকার করল দিশা।

ততক্ষণে লখী আর আমি লোকটিকে সাবধানে তুলে এনে রাস্তায় শুইয়েছি। ও পরে আছে জীন্‌স্ আর চেক শার্ট। হঠাৎ বাইকের টায়ার ফাটতে এই দুর্ঘটনা। ভাগ্য ভালো বেশি চোট লাগেনি, কিন্তু ডান হাঁটু একটা পাথরে লেগেছে, গভীর কাটা থেকে রক্ত গড়াচ্ছে।

সূর্যদা দেখালেন দুর্ঘটনার কারণ! বাঁকের ওপারে, রাস্তা যেখানে নামতে শুরু করেছে সেখানে রাস্তা জুড়ে

ছড়ানো বড় বড় বাঁকা পেরেক, খোঁচা খোঁচা কাঁচের টুকরো আর ধারালো লোহার টুকরো।

'কী কান্ড!' ধূর্জটিবাবুর চোখ কপালে।

'লোকটা হঠাৎ এসে আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। ওগুলো ছিল আমাদের জন্য', বললেন সূর্যদা। 'ও উপরে উঠছিল, তাই এগিয়ে পড়ল ঝোপঝাড়ের মধ্যে। আমরা এদিক থেকে গেলে কোথায় পড়তাম দেখেছেন? সূর্যদা দেখালেন ওই কাঁচ লোহা পেরেকের পাশে বাঁদিকে শতখানেক মিটার গভীর খাদ। আমাদের টায়ার ফাটলে নির্ঘাৎ আমরা পড়তাম ওই খাদের নীচে!

'এ কী সম্ভব! নারায়ণকোটের দোড়গোড়ায় সবাইকে খুন করার চেষ্টা!' মাথায় হাত দিয়ে স্তম্ভিত হয়ে রইলেন ধূর্জটিবাবু।

(৩)

'সূর্যদা, গুলি ছুঁড়লেন কেন?' বললে দিশা। 'যে এগুলো ছড়িয়েছে বা তার কোনও সাকরেদ পাহাড়ের গায়ে বসে ফলাফল দেখছিল। ওর বাইনোকুলার বা বন্দুকে রোদ পড়ে চকচক করছিল। কাজ হয়নি বলে যদি গুলি করে কাজ শেষ করার চেষ্টা করে, তাই জানালাম আমরাও তৈরি।'

বাইকচালকের জ্ঞান ফিরতে শুরু করছে। ধূর্জটিবাবু বললেন, 'জঙ্গলের ঠিকাদার, মুখ চিনি। না জেনেই আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছে—তাই না?'

সূর্যদা হাঁটু গেড়ে লোকটিকে পরীক্ষা করে বলেছেন, 'পা বাদে শরীরের অন্যত্র বেশি চোট লাগেনি। কিন্তু ওই ডান হাঁটুর জন্য ডাক্তার বা হাসপাতালের এমার্জেন্সি অন্তত দরকার। নারায়ণকোটে তার ব্যবস্থা করা গেলে মনে হয় ওকে নিয়েই চলি।

লোকটি জড়ানো গলায় বলল, 'রাস্তায় কিসব ছিল?

ধূর্জটিবাবু বললেন, 'আমরা নারায়ণকোটে যাচ্ছি। এঁরা রাজার অতিথি। আপনার আপত্তি না থাকলে ওখানে গিয়ে বিনে পয়সায় চিকিৎসা করে নিন।'

'ঠিক আছে। আলিপুরদুয়ার বা বনগাইগাঁও ছাড়া তো ভালো ডাক্তার হাসপাতাল নেই। আর রাজার আতিথেয়তা কী কম কথা?'

লখী দিশা আর আমি ততক্ষণে তিনটে ছোট ঝোপ কেটে ঝাড়ু বানিয়ে রাস্তা সাফ করতে শুরু করেছি। একটু বাদেই রওনা দিলাম। আরও আধঘণ্টা আঁকাবাঁকা রাস্তায় নিচু পাহাড়ের দুটো রেঞ্জ পেরিয়ে একটা অপেক্ষাকৃত চওড়া নদীর ধারে পৌঁছলাম। কিলোমিটারখানেক বাদে রাস্তায় শালকাঠের গেট।

'সামনে ভুটান ও নারায়ণকোট, বললেন ধূর্জটিবাবু।

সূর্যদা বললেন, 'বোর্ডটা দেখে রাখ!' দেখলাম লেখা আছে :

WELCOME TO NARAYANKOT STATE, BHUTAN
← INDIA ←→ BHUTAN → INTERNATIONAL BORDER
Guarded by : NARAYANI REGIMENT of ROYAL BHUTANESE ARMY (under treaty of 1868)

লখীর মতো উর্দিপরা আরও তিনজন রক্ষী এসে কথা বলছে ধূর্জটিবাবুর সঙ্গে। ওদের কাঁধে পিতলের ফলকে লেখা "RBA-NR"। বোর্ড দেখে বুঝলাম এর মানে "রয়াল ভুটানিজ্ আর্মি—নারায়ণী রেজিমেন্ট'। ওরা ফোনে নারায়ণ কাটের সঙ্গে যোগাযোগ করল, ঠিকাদারের চিকিৎসার প্রয়োজনের খবর দিল।

আমরা এবার এগোলাম নদীর ধার দিয়ে। রাস্তার দুপাশে গভীর জঙ্গলে ঢাকা খাড়া পাহাড় উঠে গেছে অন্তত হাজার মিটার। পাহাড়ের গায়ে মেঘ লেগে রয়েছে—বোঝাই যাচ্ছে খোদ হিমালয়ের মধ্যে ঢুকছি।

'আমরা এটাকে বলি নারায়ণী নদী, ভুটানের মানচিত্রে অবশ্য অন্য নাম আছে। বললেন ধূর্জটিবাবু, 'এই অঞ্চলের জঙ্গলে কাঠ কাটা নিষেধ। অল্প কিছু ট্রাইবাল ছাড়া কেউ থাকে না সীমান্ত থেকে প্রথম বারো কিলোমিটারের মধ্যে।

'বলছেন এই জঙ্গল বহু শতাব্দী অপরিবর্তীত আছে?'

'এই রাস্তাটা তৈরি ছাড়া কোনও পরিবর্তনই হয়নি এই এলাকায়।'

পাশে পাথরে পাথরে লাফিয়ে ছুটে চলেছে পাহাড়ী নদী, তিরিশ-চল্লিশ মিটার চওড়া, স্বচ্ছ পরিষ্কার জল। রাস্তা কোথাও নদীর কাছে, কোথাও পঞ্চাশ একশো মিটার উঁচুতে। মেঘ কোথাও পাহাড়ের মাথায়, কোথাও বা নেমে এসেছে রাস্তার কাছাকাছি। বেলা দুপুর আড়াইটা, কিন্তু মেঘে ঢাকা খাদের নীচে নদীর ধারে আলো-আঁধারির রাজ্য।

মিনিট কুড়ি গাড়ি চলার পর উপত্যাকাটা, নদীটা চওড়া হতে শুরু করল। রাস্তাটা এখন নদীর ধারে সমতলভূমিতে। জঙ্গলের ফাঁকে দু-চারটে ক্ষেত, কুঁড়ে পর। তারপর নদীর ধারে চষা জমির ফালি, একটা ছোট গ্রাম। ডাইনে পাহাড়ের গায়ে অল্প ফ্যাকাশে রোদ পড়েছে মেঘের ফাঁক দিয়ে। সামনে নদীটা বাঁয়ে ঘুরছে।

'মনে হচ্ছে বিকেলের রোদে একটা দারুন দৃশ্য দেখতে পাবেন!' রহস্য করে বললেন ধূর্জটিবাবু।

'নারায়ণগাঁও পৌঁছে গেছি প্রায়, তাই তো?' সূর্যদার প্রশ্নে সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে ধূর্জটিবাবু বললেন, 'তার আগে, এক্ষুণি দৃশ্যটা দেখতে পাবেন'—

নদীটা বাঁয়ে ঘুরেছে, আর ডান দিকে থেকে একটা সরু নদী এসে মিশেছে। তার আগেই রাস্তা ডাইনে ঘুরেছে নারায়ণীর উপর এক ব্রিজের দিকে। ব্রিজের মুখে রাস্তার ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ধূর্জটিবাবু বললেন, 'বাঁদিকের দৃশ্যটা কেমন লাগছে বলুন!'

আমরা ততক্ষণে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছি সেদিকে। আমাদের বাঁয়ে, নদীর ওপারে, যেন আকাশ ভেদ করে উঠে গেছে খাড়া দেওয়ালের মতন পাহাড়।

নদীর পরে ক্ষেত, তারপর জঙ্গলে ঢাকা পাহাড় উঠেছে দু-তিনশো মিটার। কিন্তু তারপর?

আশ্চর্য, অসম্ভব, অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় খাড়া দৈত্যদের দুর্গের পাঁচিলের মতো কুচকুচে কালো পাথরের দেওয়ালটা সিধে আকাশ ফুঁড়ে চড়চড় করে উঠে গেছে বোধহয় নদী থেকে হাজার মিটারের বেশি উঁচুতে। দেওয়ালের মাথায় বিকেলের হলুদ ''কনে-দেখা'' রোদ্দুরে ঝকঝক করছে নারায়ণকোট দুর্গের ধপধপে সাদা পাঁচিল।

'পিছনের পাহাড় থেকে আলাদা একটা চুড়োর ওপর দুর্গটা। ওখানে ঢোকার একমাত্র পথ পিছনের পাহাড় থেকে ওই চুড়ো অবধি একটা সাস্‌পেন্সন ব্রিজ।'

'কী আশ্চর্য, উত্তরবঙ্গের এতো কাছে এমন এক আশ্চর্য জায়গার কথা জানতাম না তো!' বললেন সূর্যদা।

'দুর্গটি চারশো বছরের পুরোনো', বললেন ধূর্জটিবাবু, 'ঊনবিংশ শতকে ভুটানীরা বার বার আক্রমণ করে। ১৮৬২ থেকে তিন বছর অবরোধ করেও ওরা দখল করতে পারেনি। ইংরেজরা ১৮৬৫-তে ভুটানের রাজধানী পুণাখা অবধি সাময়িকভাবে দখল করলেও ওরা এই দুর্গ এড়িয়ে যায়।'

'এই রাজবংশ কি খুব গোপনীয়তা পছন্দ করেন?' প্রশ্ন করেন সূর্যদা।

'ঠিক তাই। রাজার ব্যক্তিগত অনুমতি ছাড়া এই রাজ্য প্রবেশ নিষেধ।' বলতে বলতে গাড়ি চালাতে শুরু করলেন ধূর্জটিবাবু।

আধ কিলোমিটার বাদে একটা বড় গ্রাম। খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সাধারণ লোকের অবস্থা বেশ ভালো। অনেক বাইক দেখলাম, তিন-চারটে জিপ-জিপসি, গোটা দুই ট্র্যাক্টর। 'এটাই নারায়ণগাঁও, এই রাজ্যের প্রধান জনপদ', বললেন ধূর্জটিবাবু।

কয়েকটা আধুনিক বাড়ি, একটার সামনে দাঁড়ালাম—হাসপাতাল। আহত ঠিকাদারকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে গেল।

ছোট নদীর দিকে ঘুরে একটা বৃটিশ ধাঁচের অপেক্ষাকৃত পুরনো বড় বাড়ি, ঝকঝকে নতুন রঙ করা। পিছনে, আরও কাছে, আরও বিশাল, আরও বিস্ময়কর দেখাচ্ছে নারায়ণকোটের দুর্গ। 'এটা কাছারিবাড়ি', গাড়ি থামিয়ে ধূর্জটিবাবু বললেন, 'রাজ্যের সেক্রেটারিয়াটও বলতে পারেন।'

'নারায়ণকোটে স্বাগতম!' বাড়ির দরজায় হাসিমুখে দাঁড়িয়ে এক অল্পবয়সী যুবক। পরণে ধোপাদুরস্ত সরু পাজামা, পাঞ্জাবী ও জহর কোট। লম্বা, ফরসা, খুবই সুপুরুষ।

'রাজকুমার নক্ষত্রনারায়ণ!'

বসতে না বসতেই সেই সুগন্ধি চা। বললেন, 'হাসপাতাল থেকে দুর্ঘটনার খবর পেলাম। আপনাদের আসার পথে এমন ঝক্কি পোয়াতে হল বলে আমি দুঃখিত।'

'ইলেকট্রনিক লক যাদের আটকাতে লাগাচ্ছেন, তারাই তো ঝামেলা করছে—তাই না কুমার সাহেব?'

'মনে তো হয়! সূর্যদা, আমি অনেক বয়সে ছোট, আমাকে 'নক্ষত্র' বলবেন। ব্যবস্থা করছি, এখন থেকে আপনাদের সঙ্গে সর্বদা কয়েকজন সশস্ত্র রক্ষী থাকবে।'

'সূর্যদা, এখন কি আমরা ও-ই-ই ওপরে যাব?' খাড়া পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে প্রশ্ন করল দিশা।

'হ্যাঁ, আমরা ওই দুর্গেই থাকি', বলল নক্ষত্র, 'আমার বোন প্রভা বোধহয় তোমারই সমবয়সী। গল্প করার বন্ধু পেয়ে খুব খুশি হবে। বাবা অপেক্ষা করছেন, আপনারাও ক্লান্ত—এগিয়ে পড়ুন। আমি একটু কাজ সেরে রাত করে যাব।'

সূর্যদার গাড়ি এবার চালাচ্ছে নারায়ণী সেনাবাহিনীর ড্রাইভার। আমাদের সঙ্গে লখী ছাড়াও অটোমেটিক অস্ত্রধারী আরও দুজন রক্ষী। গাড়ি চলতে বললাম, 'সূর্যদা, আমাদের কি তাহলে ''জেড'' ক্যাটেগরি সিকিউরিটি?'

'তাহলে তো থাকতো শতাধিক রক্ষী, আর গোটাকুড়ি গাড়ি। আর আমরাও যেতাম পুরু লোহার পাত দিয়ে তৈরি বুলেট-প্রুফ গাড়িতে! তবে আমরা যে রাজার খাস অতিথি বুঝেছিস তো এবার!'

পিছনের পাহাড়ে পড়ন্ত ফ্যাকাশে রোদকে ফেলে রেখে এগিয়ে গেলাম নদীর ওপারের আলো-আঁধারির দিকে। কাঠের সেতু পেরিয়ে আকাশছোঁয়া পাথরের

দেওয়ালের দিকে এগোলাম। দুর্গের কিছুটা উত্তরে পাহাড় একটু কম খাড়া—সেখানে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জিগজ্যাগ রাস্তা। রাস্তাটা কয়েকশো মিটার উত্তরে গিয়ে পুরো ঘুরে দক্ষিণ মুখো হয়েছে, আবার কয়েকশো মিটার দক্ষিণে গিয়ে মোচড় খেয়ে উত্তরে ঘুরেছে।

'এই রাস্তায় এই নয় কিলোমিটার খাড়া চড়াইয়ের মধ্যে উনত্রিশটা এরকম "হেয়ার-পিন বেন্ড" আছে।' বললেন ধূর্জটিবাবু।

নদীর ধার থেকে প্রথমে পাহাড়ের নিচের দিকে ঘন জঙ্গল ছিল। নদী থেকে তিন-চারশো মিটার পর পাহাড় ক্রমান্বয়ে বেশি খাড়া হতে লাগল, কিন্তু জঙ্গল পাতলা হয়ে এল। তবে এক-একটা অতি প্রাচীন গাছ উচ্চতায় পঞ্চাশ মিটার অবধি। ওপাশে পশ্চিমের পাহাড়ের গায়ে এতক্ষণে শেষ রোদটুকু মিলিয়ে এসেছে। সব দিকে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে যে ঘন, নিরবিচ্ছিন্ন, জমাট-বাঁধা অন্ধকার ছিল, তা ক্রমেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। দুদিকের পাহাড়ের মাথা থেকে গড়িয়ে নামছে মেঘের স্রোত।

কেতরে পড়েছে, ড্রাইভারের জামায় লাল ছোপ—রক্ত! তিনজন রক্ষী উবু হয়ে বন্দুক বাগিয়ে গুলি ছুঁড়ছে বাঁয়ে, উপর দিকে—কি একটা সাদা নড়ল ওদিকে—

লখী ওয়াকি-টকিতে যোগাযোগ করল দুর্গের সঙ্গে। বলল, 'দ্বিতীয় ক্রোশ চিহ্ন হয়ে খাড়া বাঁকটার পাশে —'

কয়েক মিনিটের মধ্যে উঁচুতে দেখতে পেলাম হেডলাইট জ্বালিয়ে দুর্গ থেকে বেরল দুটো গাড়ি। ওদের দেখেই বোধহয় প্রতিপক্ষ চম্পট দিল।

(৪)

অনেকক্ষণ চুপচাপ। সূর্যদা লখীকে বললেন, 'দেখ তো ড্রাইভারের কতটা চোট লেগেছে!' লখী সাবধানে টর্চ জ্বালিয়ে জামা সরিয়ে দেখে বলল, 'গুলি লেগেছে, কাঁধে!'

দিশার হাত মচকেছে, আমার পায়ে কেটেছে, সূর্যদার কুনুই আর গালে ছড়েছে—অন্য তিনজনেরও ওইরকমই —একমাত্র ড্রাইভারেই চোট গুরুতর।

ক্রমশ আকাশে শুধু আবছা আলো, আর সর্বত্র অন্ধকার—গাড়ি চলেছে হেডলাইট জ্বালিয়ে।

হঠাৎ—'কড়-কড়-কড়-কড়' বিকট শব্দ—ড্রাইভার প্রাণপণে স্টিয়ারিং ঘোরাল বাঁয়ে—পাহাড়ের দিকে—ঝাঁকুনি, ধাক্কা, লাফ—ছিটকে পড়লাম ....'ফট'-'ফট'-'ফট'—শব্দ—সামনে রাস্তা আটকিয়ে বিশাল এক গাছের গুঁড়ি—'শুয়ে পড় নালায়', বলে সূর্যদা দিশাকে জোর করে মাটিতে, নিচে শুইয়ে দিলেন,—জিপ

অজানা প্রতিপক্ষ নারায়ণকোটের দোরগোড়াতেই আমাদের খতম করার চেষ্টা করছে! ছ'ঘন্টার মধ্যে দ্বিতীয় চেষ্টা! বাড়তি দুজন রক্ষী না থাকলে কি যে হতো বলা মুস্কিল! কারা ওরা? কী উদ্দেশ্য ওদের?

মিনিটদশেকে গাড়িদুটো পৌঁছে গেল। জনাদশেক সশস্ত্র রক্ষী। সূর্যদা যন্ত্রপাতির বাক্সগুলো লখীকে বুঝিয়ে দিলেন। আহত ড্রাইভার ও আমাদের তিনজনকে নিয়ে প্রথম গাড়িটি ফিরে চলল আগে। সঙ্গে চারজন রক্ষী।

লখী মাল গুছিয়ে বাকিদের নিয়ে আসবে দ্বিতীয় গাড়িতে। গাছটাকে সরাবার জন্য লোক পাঠাতে রেডিওতে খবর গেল নক্ষত্রের কাছে।

ঘন অন্ধকারে ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরে ঘুরে চলেছি খাড়া পাহাড়ী রাস্তা বেয়ে। দুর্গের কাছে পৌঁছলাম। প্রধান উঁচু পাহাড় থেকে পাশে একটা আলাদা পাহাড়ের চুড়োর উপর দুর্গ। দূর্গের দিকে খাড়া নামছে রাস্তাটা। দুদিকে নেমে গেছে খাড়া খাদ। দেখে মনে হচ্ছে দুর্গটা অন্ধকার আকাশে যেন একটা ভাসমান আলোকিত দ্বীপ। যেন কোন যাদুবলে শূন্যে ভেসে আছে ওটা।

আমাদের ফোর-হুইল ড্রাইভ গাড়িও খুব আস্তে নামছে খাড়া রাস্তা দিয়ে। বুঝলাম, সম্ভাব্য আক্রমণ রুখবার জন্যই এভাবে তৈরি দুর্গটি। তবে এখন শুনছি জেনারেটরের শব্দ, দেখছি বৈদ্যুতিক আলো। শেষে ঝোলানো সেতু। পার হয়ে দুর্গের ফটক।

ফটক খুলল। দুর্গের চত্তরের মধ্যে ঢুকল আমাদের গাড়ি। পাঁচ-ছ'জন রক্ষী, তাদের পরণে শার্ট-প্যান্ট নয়, ধুতি আর কুর্তা। অবাক হয়ে দেখলাম, প্রত্যেকের কাঁধের পিতলের ফলকে বাংলায় লেখা—

অবাক হলাম, কারণ ধুতি-কুর্তার ইউনিফর্মের উপর বেল্ট লাগিয়ে রিভলভার পরতে আগে কাউকে দেখিনি!

একজন রক্ষী আমাদের গাড়ি থেকে নেমে প্রাসাদের সিঁড়ির দিকে এগোবার ইশারা করল। বিরাট দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এক ফর্সা, লম্বা, মাঝবয়সী, ব্যক্তিত্বপূর্ণ, সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক। তাঁর গায়ে এক অপূর্ব কাশ্মীরী শাল। তিনি বললেন, 'আমি অত্যন্ত লজ্জিত। আমাদের অতিথিরা এমন বিপদে পারেন চিন্তাই করিনি!'

বুঝলাম ইনিই রাজা বিক্রমনারায়ণ। সূর্যদা নমস্কার করে বললেন, 'আপনি ও নক্ষত্র তো যথেষ্ট ব্যবস্থা করেছেন।'

দুর্গের মধ্যেই প্রাসাদোপম বাসস্থানও। চওড়া বারান্দা দিয়ে এগোচ্ছি, দুপাশের দেওয়ালই বড় বড় পাথরের চাঁই গেঁথে তৈরি করা। মিটার-পাঁচেক বাদে বাদেই দেয়ালে টাঙ্গানো এক-একটা প্রাণীর মাথা বা ছাল। তারপরে সামনেই বিশাল বৈঠকখানা। সেখানে বিলিতি কায়দায় কার্পেট-সোফা-ঝাড়লণ্ঠন, আর চার দেওয়ালে টাঙ্গানো এক-একটা প্রাণীর মাথা বা ছাল। তারপর সামনেই বিশাল বৈঠকখানা। সেখানে বিলিতি কায়দায় কার্পেট-সোফা-ঝাড়লণ্ঠন, আর চার দেওয়ালে গোটা তিরিশেক বড় বড় কায়দা-করে বাঁধানো পোরট্রেট। 'ষোড়শ শতাব্দীর নরনারায়ণ থেকে শুরু করে বাবা দুর্জয়নারায়ণের অবধি ছবি রয়েছে', বললেন রাজামশাই।

'তখনকার পেয়ন্টিং?' সূর্যদার প্রশ্ন।

'শেষ ছ-সাতটা বসিয়ে-আঁকা পোরট্রেট। আগেরগুলো বর্ণনা ও কাঁচা হাতে আঁকা ছবি থেকে ওস্তাদ পেয়ন্টারদের দিয়ে আঁকানো হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে।' ইতিমধ্যে হাজির সেই দুর্দান্ত ফ্লেভরের চা। ইতিহাস নিয়ে আলোচনা চলল, '১৮৩২ থেকে বীর্যনারায়ণের সময় ভুটিয়ারা রাজত্ব বিস্তার করে দার্জিলিং থেকে গৌহাটি পর্যন্ত। খোদ কোচ রাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ ওদের হাতে বন্দী হন। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও ভুটিয়ারা নারায়ণকোটকে হারাতে পারেনি।

'১৮৬৮ সালে লন্ডনে গিয়ে বীর্যনারায়ণ বৃটিশ সরকারের সমর্থন লাভ করেন। নারায়ণকোটের সামরিক গুরুত্বের জন্য বৃটিশ সরকার এক বিশেষ চুক্তি করতে রাজি হন যাতে করদরাজ্য না হয়ে নারায়ণকোট অনেকটা স্বাধীনতা নিয়ে ইংরেজদের বন্ধুরাজ্য হিসাবে স্বীকৃত হয়। আর তারপর থেকেই এই সোফা-কার্পেট-ঝাড়লণ্ঠন-পেয়ন্টিং আসে—'

'বাবা! ওঁরা এসেছেন বলনি!' ঘুরে ঢুকেই নালিশ জানাল নীল শাড়ি পরা ফর্সা লম্বা এক তরুণী।

'ইনি নিশ্চয়ই রাজকন্যা প্রভাবতী!' বললেন সূর্যদা।

'আমি আপনাদের সঙ্গে দেখা হবার দিন গুনছি', দিশার পাশে বসে বলল প্রভা, 'আর বাবা কিনা আমাকে মাস্টারের কাছ থেকে পড়ার একটু ছুটিও দিলেন না।'

'প্রভার সত্যি খুব মুস্কিল। ওর এখানে বন্ধুবান্ধবের একান্তই অভাব। তিন শিক্ষক ওকে বিভিন্ন বিষয় পড়ান। একজন এখানেই থাকেন। দুঃখের বিষয় নারায়ণকোট রাজ্যে ভালো হাই স্কুলও নেই, কলেজ তো আদৌ নেই।' তারপর মেয়ের দিকে ফিরে রাজা বললেন, 'ওঁদের অনেক ধকল গেছে প্রভা। এখন ওঁদের ঘর দেখিয়ে দাও— একটু বাদে খাবার টেবিলে বসে আবার কথা হবে।'

ঘরে যাবার পথেই দিশা ও প্রভা নীচু গলায় এমন গুজগুজ ফুসফুস শুরু করল যেন বন্ধুত্ব ওদের দশ মিনিটের নয়, দশ বছরের।

খেতে যাবার আগে সূর্যদা একবার গিয়ে নক্ষত্র ও ধূর্জটিবাবুর সঙ্গে আমাদের যন্ত্রপাতির তদারকি করে এলেন। আহত ড্রাইভারের খবরাখবর নিলেন। ওঁরা মিলে ঠিক করলেন যে আপাতত দিশা ও প্রভার সামনে আমাদের উপর আক্রমণ ও বিপদের কথা বেশি আলোচনা করা হবে না। ধূর্জটিবাবু মনে করিয়ে দিলেন

যে রানী মারা গিয়েছেন বছর দুয়েক আগে, আমরা যেন সেই বিষয়ে প্রশ্ন না করি।

রাতে খাবার টেবিলে আমরা তিনজন, রাজা, নক্ষত্র, প্রভা ও ধূর্জটিবাবু। ইতিহাসের আলোচনায় সূর্যদা কথা তুললেন মহম্মদ-বিন-বক্তিয়ারের আক্রমণে সেনবংশের পতনের কথা। রাজা বললেন, 'ত্রয়োদশ শতাব্দীর উত্তরবঙ্গের ইতিহাসের কথা খুব কম বাঙালীই জানে। ঐতিহাসিক মীনহাজ্জুদিনের বই থেকে আমরা শুনি 'অষ্টাদশ অশ্বারোহী'র হাতে লক্ষণ সেনের পরাজয়ের কথা। কিন্তু সেই বইতেই আছে কামরূপের মহারাজ পৃথুর কৌশলে বখতিয়ারের শোচনীয় পরাজয়ের কথাও।

'১২০৬ সালে পাঠানসেনা কামরূপ আক্রমণ করতে যায় ব্রহ্মপুত্রের উত্তর দিয়ে। ওদের অভ্যেস ছিল সর্বত্র যাবার পথে গ্রাম লুটপাট করে খাবার সংগ্রহ করা। কামরূপ রাজ্যে ঢুকতেই ওরা দেখে গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য; ঘরে, ক্ষেতে বা গাছে কোথাও বিন্দুমাত্র খাবার নেই। মহারাজ পৃথুর নির্দেশে গ্রামবীসারা যা করে তা এর ছশো বছর বাদে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে রাশিয়ানদের 'স্কর্চর্ড আর্থ পলিসি'র মতোই। খিদের জ্বালায় পাঠানদের মনোবল ভাঙ্গতে শুরু করে। এই অবস্থায় ওরা গৌহাটির উত্তরে পুষ্পভদ্রা নদী পার হতে গেলে হঠাৎ সামনে পথ আটকায় কামরূপী তীরন্দাজেরা। দশ হাজার পাঠান সৈন্য ও ঘোড়ার অধিকাংশই ওই যুদ্ধেই মারা যায়। পালাবার পথে ছত্রভঙ্গ হয়ে কামরূপী সৈন্যের তাড়া খেয়ে মরে আরও বহু পাঠান সেনা। বখতিয়ার নিজে মাত্র শতখানেক সৈন্য নিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে যেতে সক্ষম হন।'

নক্ষত্র বলতে যাচ্ছিল, 'এই পৃথুরাজার—'

প্রভা মুখে আঙ্গুল দিয়ে বারণ করল। রাজা বললেন, 'পরের কথা আগে ফাঁস কোরো না!'

দিশা আর আমি সমস্বরে বললাম, 'তারপর কী হলো?'

'জলপাইগুড়ি ও বাংলাদেশের রঙপুর থেকে আসামের অনেকটাই তখন পৃথুরাজার কামরূপ রাজ্যে ছিল। বখতিয়ারের বিশ বছর বাদে সুলতান গিয়াসুদ্দিন কামরূপ আক্রমণ করে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন।'

'পরের বছর দিল্লীর বাদশাহের এক বিশাল বাহিনী কামরূপ আক্রমণ করলে পৃথু রইলেন কুচবিহারের দক্ষিণে পঞ্চগড় নামে এক বিরাট দুর্গে। কিছুদিন অবরোধের পর পঞ্চগড় যখন পতনের মুখে তখন বৃদ্ধ পৃথু আত্মহত্যা করেন। তাঁর ছেলে সন্ধ্যা রায় রাজ্যের কিছু অংশ বিসর্জন দিয়ে শান্তিচুক্তি করেন। কিন্তু পরের বছরেই সন্ধ্যা রায় সম্পূর্ণ উত্তরবঙ্গ থেকে পাঠানদের বিতাড়িত করেন।'

বললাম 'এ তো দারুন ইতিহাস! আর নক্ষত্র কী বলছিলেন?'

'অধৈর্য হবেন না', রাজা হেসে বললেন, 'ভল্টে কয়েকটি অমূল্য সম্পদ আছে যা পরিবারের বাইরের লোকদের আমরা সচরাচর দেখাই না। কিন্তু আপনারা তো সবই দেখবেন!' সূর্যদা ভল্টের বিষয়ে প্রশ্ন করলে আবার বললেন, 'হ্যাঁ, ভল্ট থেকে চুরির এক ষড়যন্ত্র হচ্ছে খবর পেয়েই আমরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করি।'

নক্ষত্র যোগ করে, 'আমাদের প্রাসাদের অধিকাংশ কর্মীই আমাদের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত পাঁচ-দশ পুরুষ ধরে। ওদের দু-এক জনকে হাত করার চেষ্টা হলে আমরা তার খবর পেয়ে যাই।'

সূর্যদার প্রশ্ন, 'আপনাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে কে?'

'আমাদের বিশ্বাস এই প্রতিপক্ষ হ'ল কাঠের ব্যবসায়ী মহাদেব চৌধুরী।' বলল নক্ষত্র, 'সে আসাম, মেঘালয়, অরুণাচল ও ভুটানের বেশ কিছু জঙ্গলে বেআইনিভাবে কাঠ কেটে বহু কোটি টাকার মালিক হয়েছে। সম্প্রতি যতদূর মনে হয় সন্ত্রাসবাদীদের অস্ত্র সরবরাহ করেও সে বহু টাকা করছে।'

সূর্যদা বললেন, 'ওরা আমাদের তিনবার ভয় দেখিয়ে চিঠি দিয়েছিল। তারপর, আজকেই দুবার আমাদের মারবার চেষ্টা করে বিফল হয়েছে। ওরা তো ছেড়ে দেবার পাত্র নয়!'

'একদম ঠিক!' নক্ষত্র বলল, 'সারা দুর্গে কড়া পাহারা রাখতে বলেছি। কাজটা কিন্তু তাড়াতাড়ি সারতে হবে। যতদূর জানি মহাদেব এখন আমাদের রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তের অল্প বাইরে কাঠ-কাটার এক ক্যাম্পে রয়েছে।'

'এই ক্যাম্পটা কি বে-আইনি?'

'না। ভুটান সরকারের অনুমতি নিয়ে সে ক্যাম্প করেছে এমন জায়গায় যাতে তার অন্য দু-নম্বরী ধান্দায় সুবিধা হয়। আমাদের বিশ্বাস ওখান থেকে সন্ত্রাসবাদীদের অস্ত্র পাচার করা হয়। কিডন্যাপ করা কিছু বড়লোক ব্যবসাদারকেও লুকিয়ে রাখা হয়। আবার এখন এই চক্রান্ত করছে সে!'

'ভল্টের কাজ বেশি তাড়াতাড়ি করতে', বললেন সূর্যদা, 'আরও দু-একজন সহকারী পেলে সুবিধা হবে।'

রাজার চোখের ঝিলিক ও মুচকি হাসির সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলল নক্ষত্র ও প্রভা। ধূর্জটিবাবু বুঝিয়ে বললেন,

‘ওরা দুজনেই অভিজ্ঞ ‘হ্যাম’, মানে অ্যামেচার রেডিও চালাতে ও বানাতে জানে ওরা।’

‘এই অজা পাহাড়-জঙ্গলে বসে পৃথিবীর সব কোণার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে দারুণ মজা।’ বলল নক্ষত্র, ‘আর এখানে রেডিও ট্রান্সরিসিভার চালু রাখতে গেলে তার মেরামতির কাজ তো অবশ্যই জানতে হয়!’

(৫)

পরদিন সকাল আমাদের জীবনের এক স্মরণীয় মুহূর্ত। প্রথমবার নারায়ণকোট দুর্গ থেকে নিচে তাকাবার অভিজ্ঞতা! চারদিকে পাহাড় ও ঘন জঙ্গল। মনে হয় আকাশে তার উপর ভেসে রয়েছি, হয়তো বা যাদুবলে। বুঝি বা পুরো দুর্গটাই মেঘের মতো ভেসে রয়েছে আকাশে। মনেই হয় না পাহাড় বা মাটির সঙ্গে এই দুর্গের কোনও যোগ আছে!

দুর্গের প্রাচীরের নিচে সেই ‘দৈত্যদের দেওয়াল’। খাড়া, বিলকুল খাড়া, সটান নেমে গেছে সেটা ছ-সাতশো মিটার। খুব কসরৎ করে মাথা বাড়িয়ে না দেখলে পায়ের তলার দেওয়ালকে দেখাই যায় না।

বেশি দেরি নয়—কাজ শুরু করতে হবে। ঠিক করা হয়েছে তিন বা চার দিনের মধ্যে কাজ শেষ করা দরকার। বর্তমান ভল্টের চেহারাও রীতিমতো সমীহ করার মতো। একটা বড় শহরের বড় ব্যাঙ্কের দশ-বিশ কোটি টাকা রাখার ঘরকে আনা হয়েছে ভুটানের এই নির্জন পাহাড়ের মাথায়। নিরাপত্তা তার চেয়েও বেশি, কারণ কোনও ব্যাঙ্কের ভল্ট তো সাধারণত বিশাল পাথরের পাহাড় কেটে বানানো হয় না! ব্যাঙ্কসুলভ দশ সেন্টিমিটার পুরু ইস্পাতের দরজা, তিনটে বিরাট বিশ লিভারের চাবির গা-তালা। উপরন্তু দুটো নম্বরের চাকতি—চাকতিকে গোপন

নম্বরের ওপর না বসালে চাবি দিয়েও দরজা খুলবে ন। আমাদের ও প্রভাকে নিয়ে ভল্টে ঢুকলেন রাজা। বাইরে রইল নক্ষত্র ও চারজন সশস্ত্র রক্ষী।

দুপাশের তাকে নানা বাক্স, থলি, কিছু কাঁচের শো-কেস। সামনের দেওয়ালে সারি সারি লকার। দিশা বললে, 'কাল রাতে বলেছিলেন—'

ধৈর্য ধরতে ইশারা করে সামনের একটা মিটার দেড়েক চওড়া বিরাট লকার খুললেন রাজা। ভেতরে একটা ঝকমকে ভেলভেটের চাদর পাতা। তার উপর একটা লম্বা, চকচকে তরোয়ালের খাপ, সোনা-বাঁধানো, মণি-মুক্তো বসানো। 'হ্যাঁ, পৃথু রাজার তলোয়ার। আর পাশের লকারে আর একটি জিনিস আছে যা পূর্ব ভারতের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।'

'বাবা! আগে ঘটনাটা বলো!' বলে প্রভা।

'আচ্ছা, কাল যা বলছিলাম—সন্ধ্যা রায়কে বহুদিন ঘাঁটায়নি পাঠানেরা। শেষে কিন্তু ১২৫৭ সালে বাংলা-বিহার-অযোধ্যার শক্তিশালী সুলতান মালিক ইক্তারুদ্দীন উজবেক এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে কামরূপ আক্রমণ করেন পাঠানদের চতুর্থ অভিযানে।

'সম্মুখ সমরে জেতা অসম্ভব দেখে সন্ধ্যা রায় রাজধানী ছেড়ে পিছু হটেন ও শহর ও গ্রামের সব অধিবাসীকে নির্দেশ দেন সব খাদ্যদ্রব্য নিয়ে ওই অঞ্চল ছেড়ে চলে যেতে। উজবেক পরিত্যক্ত রাজধানী দখল করে দেখেন কোথাও একবিন্দুও খাবার নেই। বর্ষা শুরু হতে কামরূপীরা বাঁধ ভেঙ্গে রাজধানীর তিনদিকের জমি বন্যায় ভাসিয়ে দেয়। পাঠানেরা অনাহারে থেকে জলের ফাঁদে বন্দী হয়ে পড়ে।

'নিরুপায় হয়ে উজবেকের বাহিনীকে পিছু হটতে হয় গারো পাহাড়ের মধ্যে অজানা, সংকীর্ণ পথ দিয়ে। এক সরু উপত্যকার দু-পাশের পাহাড়ে প্রস্তুত থাকে কামরূপীরা। পাঠানেরা সেখানে ঢুকতেই তারা দু-পাশের জঙ্গলের আড়ালে থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুঁড়তে থাকে। পাঠানেরা প্রাণের দায়ে লড়ছে। হঠাৎ হাতির পিঠে বসা মালিক উজবেকের বুকে একটি তীর গিয়ে বেঁধে। মৃতপ্রায় অবস্থায় বন্দী হ'ন তিনি। পাঠান সৈন্য সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়।'

দ্বিতীয় এক বড় লকার খুলে রাজা দেখালেন সোনার পাতে মোড়া একটি তীর। 'এই তীর উজবেকের বুকে লাগার পরেই তাঁর সেনাদল ছত্রভঙ্গ ও নিশ্চিহ্ন হয়। তার পর প্রায় পঞ্চাশ বছর পাঠানেরা উত্তরবঙ্গ ও আসামকে এড়িয়ে চলে।'

এবার কাজ শুরু। গোড়াতে সূর্যদার সঙ্গে আমরা ভল্টের সব অংশের মাপ নিলাম। সূর্যদার খসড়া ড্রয়িং অনুযায়ী দিশা আর প্রভা পাথরের দেওয়াল দিয়ে কোথা দিয়ে কি কি তার যাবে তা রঙিন ক্রেয়ন দিয়ে চিহ্নিত করছে। আমি মাপ বলছি, সূর্যদা তাঁর ল্যাপটপ কম্পুটারে বহুরঙা সার্কিট ডায়াগ্রামে তারের মাপজোক নোট করছেন।

ভল্টের দরজায় কাটাকুটির হিসাব, ম্যাপ, নক্সা। দরজার গায়ের তারের ছক, মাপের হিসাব। তারের রিল খুলে মাপমতো কাটতে শুরু করলাম। কাজ এগোচ্ছে। এবার ভল্ট বন্ধ করে দুপুরের খাওয়ার বিরতি। ফিরে এসেই দেওয়ালে তার লাগাতে শুরু করব।

রক্ষীরা ভল্টের মুখে পাহারায় থেকে যাবে। আমরা এগোচ্ছি। সূর্যদা আর নক্ষত্রের আগে আমি। সিঁড়ির দিকে যাচ্ছি—হঠাৎ মনে হলো সামনে এক ছায়ামূর্তি—এগোচ্ছে বাঁয়ে। সিঁড়ি—নিচে নামছে—পিছু নিলাম—আলো কম, দিনের বেলাতেও আলো-আঁধারি এদিকটায়। নিচে, আরো নিচে, নামছে তো নামছেই সিঁড়ি—আমার সম্পূর্ণ অজানা জায়গা।

লোকটাকে অন্ধকারে হারিয়ে ফেললাম—সাবধানে গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছি—হঠাৎ লাফিয়ে এলো একটা লোক—আমার মাথায় বাড়ি—সব গুলিয়ে গেল—আর কিছু মনে নেই।

[চলবে]

ছবি: সুদীপ্ত দত্ত

কুইজ

ঝরঝর বরিষে

সুগত রায়

১। "এসো এসো ওগো শ্যামছায়াঘন দিন", এই বর্ষার রবীন্দ্রসঙ্গীতটির বৈশিষ্ট কী?

২। বর্ষার অনুসঙ্গে কালিদাসের মেঘদূত প্রায় সকলেরই পরিচিত, কিন্তু কবি কুন্দনলালের মেঘদূত কার লেখা?

৩। শরদিন্দুর একটি গল্পে (অলৌকিক) ঠাকুরমার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। সেটা কী?

৪। এক বিশিষ্ট কবি বলেছেন "বর্ষার উজ্জ্বল শষ্য" এই জিনিসটা কী? কবি কে?

৫। এক পশলা তুমুল বৃষ্টির মধ্যে একটা বিশেষ কিছুর আবির্ভাব এক কেরানীর জীবনের বদলে দেয় কার আবির্ভাব? কিভাবে বদলে দেয়?

৬। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় "বর্ষায়" বইটি উৎসর্গ করেছেন রবীন্দ্রনাথকে কোন বিশেষ অভিবায়?

৭। ছাতা হারানো ও ফিরে পাওয়া নিয়ে একটি গল্পের নাম———ছাতা। গল্পের নাম কী? লেখক কে?

৮। চারিদিকে অন্ধকার করা বৃষ্টিতে গোল করার রেকর্ড করেছিলেন কে? কটি গোল করেছিলেন তিনি?

৯। 'ইলশে গুড়ি ইলশে গুড়ি ইলিশ মাছের ডিম'। কার লেখা পংক্তিটি?

১০। একটানা মুষলধারে বৃষ্টিতে দুটি খুন। কোন বাংলা ছবিতে?

১১। 'সন্ধ্যা হইয়াছে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে......। সেই কালো ছাতাটি দেখা দিয়েছে।' কার লেখা, কোন বইয়ের অংশ?

১২। বৃষ্টিসিক্ত ভারি মাঠে সেই সময় ভারতীয় ফুটবলে দ্রুততম গোল করেছিলেন কে?

১৩। বর্ষায় রাখিবন্ধন একটি বিশিষ্ট উৎসব। এই তিথিতে এক বিশিষ্ট বাঙালির জন্ম। কে তিনি?

১৪। প্রবল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বর্ষলোচনবাবু উদ্ধার পেয়েছিলেন কার সাহায্যে?

১৫। "ওরে মেঘ দূরে, যা শিগগির উড়ে......."। কোন প্রিয় দলের খেলাতে এই লাইনদুটি কার পর উচ্চারিত হত?

১৬। 'বৃষ্টি বেগভরে, রাস্তা গেল ডুবিয়ে।" কার লেখা বর্ষার বর্ণনা।

উত্তর

১। রবীন্দ্রনাথের শেষ বর্ষার গান।

২। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

৩। আকাশ বলে দিলেই বৃষ্টি হবে।

৪। ইলিশ মাছ, বুদ্ধদেব বসু।

৫। [illegible]

৬। [illegible]

৭। [illegible]

৮। [illegible]

৯। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

১০। [illegible]

১১। রবীন্দ্রনাথ, ছিন্নপত্র।

১২। মহম্মদ আকবর।

১৩। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৪। লম্বকর্ণ (ছাগল) (সূত্র: পরশুরাম)

১৫। [illegible] মোহনবাগানের খেলায়। [illegible]

১৬। সুকুমার রায়।

সুতোর লড়াই

পিনাকী গুহ

দৃশ্য—১

[পর্দা খুললে দেখা যায় একজন দর্জি কাজ ক'রছে। তার বউও তাকে সাহায্য করছে। তার ছেলে পড়াশুনা করছে।]

দর্জি বউ।। অভাব, অভাব, অভাব। এ সংসারে অভাব কোনদিন ঘুচবে না। একটু ভাল খাওয়া একটু ভাল পরা। একটু ভাল থাকার জন্য যতই খেটে মর। কিস্যু হবে না।—উঃ—

দর্জি।। কি হোল গো? সূঁচ ফুটলো?

দর্জি বউ।। সূঁচ ফুটবে না তো ফুল ফুটবে?

ছেলে।। (সুর করে পড়তে থাকে)

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে
কদমতলায় কে?
হাতি নাচছে ঘোড়া নাচছে
সোনামণির বে।
সিংহমশাই, সিংহমশাই
মাংস যদি চাও

—মা কতদিন মাংস খাইনি, কাল মাংস রাঁধবে?

দর্জি বৌ।। মন দিয়ে পড়তে থাক। মাংস খাবে। চচ্চড়ি জোটাতে হিমসিম খেতে হয়।

ছেলে।। বেশ তো হিমশিমই রাঁধো। খাই।

দর্জি বৌ।। সুতো, তোর লেখাপড়ায় মন আছে কি নেই?

দর্জি।। সুতো বড়দের মধ্যে কথা বলতে নেই। খামোকা ওকেই বা বকছ কেন? আমারই বলে—

দর্জি বৌ।। ও তোমারও। তা আনো একটা গোটা মুরগী। মুরোদ বুঝি।

দর্জি।। রাগ করছ কেন? মুরগী না হোক অন্ততঃ মুরগীর ডিম তো আনা যেতে পারে। সত্যি শাকচচ্চড়ি খেতে খেতে জিবের উপর শ্যাওলা পড়ে গেছে। এই তো দেখ (জিভ বার করে দেখায়) এ্যা—

দর্জি বৌ।। এ্যাঁ, সত্যি ক'রে বল তো কি খেয়েছ?

দর্জি।। কি খাব? ও হো সনাতনের দোকানে বোতাম কিনতে দিয়েছিলুম না। তা ও শুক্তো রাঁধছিল, বলল, একটু চেখে দেখ তো নুন মিষ্টি ঠিকঠাক হ'ল কিনা?

দর্জি বৌ।। লঙ্কাবাটা, পেঁয়াজ, রসুন, তেলে ঝোলে লাল লাল শুক্তো।

দর্জি।। লাল! পান, ভুঁড়ের দোকানের সামনে রঘুনাথের সঙ্গে দেখা—বললে নাও দাদা একখানা মিঠে পাত্তি পান...

দর্জি বৌ।। মিঠে পাত্তি। মিথ্যেবাদী। ঘরে বৌ ছেলেকে ফেলে হোটেলে মাংস খেয়ে এলে। (কাঁদতে থাকে, ছেলে উঠে আসে।)

ছেলে।। কি হোল মা?

দর্জি বৌ।। তোর বাবার পেটে এত (কান্না)

ছেলে।। পেটে! পেটে ব্যথা, ও বাবা তোমার পেটে ব্যথা তো মা কাঁদছে কেন?

দর্জি বৌ।। ওরে তোর বাবা হোটেল থেকে মাংস খেয়ে এসেছে। (ছেলে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে উচ্চস্বরে 'মাংস' 'মাংস' বলে কাঁদতে থাকে।)

দর্জি।। কালই। কালই এই জামা দুটো বেচে বাজার থেকে মুরগীর ডিম কিনে আনবো।

দর্জি বৌ ও ছেলে।। কি মুরগীর ডিম! মাংস না?

(দুজনে উচ্চস্বরে 'ওরে মাংস না' বলে কেঁদে ওঠে। অন্ধকার।)

দৃশ্য—২

[আলো জ্বালতেই দেখা যায় বাজারের রাস্তা। লোকজন যাতায়াত করছে। দর্জি ঢোকে, হাতে জামার প্যাকেট]

দর্জি।। মাংস, মাংস। কোন্‌দিন এরা আমার মাংস খুব্‌লে খাবে কে জানে। জামাদুটো বেচে আজ মুরগীর মাংস নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। বৌ ছেলের হুকুম। কাল হোটেল থেকে দু-টুকরো মাংস কিনে খেয়েছি বলে কি ঝামেলাটাই না ক'রল।

(মুরগীর ডাক শুনে সচকিত হয়)

মুরগী। আহা খাসা নধরকান্তি। উবু হয়ে বসে আছে। ধারে কাছে কেউ নেই। ধরতে গেলে ব্যাটা চ্যাঁচাবে না তো। কিন্তু এই মওকা ছাড়া উচিত নয়। (বেরিয়ে যায়)

(নেপথ্যে মুরগী ধরার শব্দ। হাসি মুখে জামার ব্যাগটা বগলে চেপে হাতে একটা বড়সড় ডিম নিয়ে দর্জির পুনঃপ্রবেশ)

—ডিমসমেত গোটা মুরগী। মুরগী সাথে ডিম ফাউ। কেউ দেখে ফেলল না তো? না এবার চম্পট দেওয়াই ভাল।

(বৃদ্ধ জহুরীর সাথে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। মুরগী ডেকে ওঠে)

জহুরী।। আরে দর্জি ভায়া। তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম। আমার জামাদুটোর কি হোল?

দর্জি।। হয়ে গেছে। দিতেই যাচ্ছিলাম। এই তো (ব্যাগ হাত ঢুকিয়ে থেমে যায়) কাল দেবো।

জহুরী।। তোমার হাতে ওটা কি?

দর্জি।। ডিম

জহুরী।। কিসের ডিম?

দর্জি।। ঘোড়ার ডিম।

জহুরী।। এ্যাঁ।

দর্জি।। ইয়ে-মু-মু-মুরগীর ডিম।

জহুরী।। এতবড় মুরগীর ডিম!

দর্জি।। মুরগীটাও তো এ্যাত বড়। (হাত দিয়ে প্রকান্ড সাইজ দেখায়)

জহুরী।। ডিমটা দাও তো দেখি।

(দর্জি ডিমটা দেয়। জহুরী ভাল করে দেখে নিয়ে।)

জহুরী।। ডিমটা বেচবে আমায়। ভাল দাম দেব।

দর্জি।। ভাল দাম? কত দেবেন?

জহুরী।। কুড়ি টাকা।

দর্জি।। (স্বগতঃ) মাথার গোলমাল হয়েছে নাকি?

জহুরী।। ইতস্ততঃ করার দরকার নেই। পঞ্চাশই দেব।

দর্জি।। আজ কার মুখে দেখে উঠেছিলাম রে?

জহুরী।। এ্যাঁ।

দর্জি।। না ইয়ে...ঐ....আরেকটু উঠুন।

জহুরী।। ষাট

দর্জি।। বালাই ষাট

জহুরী।। সত্তর

দর্জি।। আরেকটু

জহুরী।। আশি

দর্জি।। আসি, নমস্কার।

জহুরী।। নব্বুই

দর্জি।। (স্বগতঃ) বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, শেষকালে মুরগী সমেত না ধরা পড়ে যাই। (প্রকাশ্যে) ভাঙ্গানী নেই। আপনি পুরোটাই দিন। একশো...

জহুরী।। বেশ তাই নাও।

(জহুরী একশো টাকার নোট বার করে দেয়। দর্জি চলে যায়।)

জহুরী।। হুঁ, হুঁ, আমি এ তল্লাটের সেরা জহুরী। জহর চিনতে ভুল হয় না আমার। এ যে সে মুরগীর ডিম নয়। এই ডিম নিয়মিত খেলে মানুষের বয়স ক্রমশঃ কমতে থাকবে। হা! হা! হা! কিন্তু মুরগী! ঐ মুরগীটা যদি দর্জি খেয়ে ফেলে তা হ'লে। তা'হলে তো আর ডিম পাব না। এ্যাই এ্যাই দর্জিভায়া ও দর্জিভায়া (প্রস্থান—অন্ধকার)

দৃশ্য—৩

[আলো জ্বলে। দর্জির বাড়ি। জহুরীর প্রবেশ।]

জহুরী।। দর্জি ভায়া, দর্জি ভায়া।

দর্জি।। আসুন, আসুন, আপনার জামা নিয়ে যান।

জহুরী।। জামা তুমি পর। আমাকে মুরগী....

দর্জি।। (স্বগতঃ) হ্যাঁ, মুরগী দিতে হবে। কিন্তু মুরগী তো দেওয়া যাবে না। জহুরী সাহেব। আমার বৌ তাহ'লে আমাকে কাবাব বানিয়ে খাবে, আপনি আপনার টাকা নিয়ে যান। আমি কস্মিনকালে এই অপরাধ আর করব। না আমার অন্যায় হয়ে গেছে। দয়া করা পাঁচকান ক'রবেন না। (কেঁদে ফেলে।)

জহুরী।। তোমায় মুরগী দিতে হবে না। শুধু ডিম দিয়ে যাও। ঐ একশো টাকা করেই দেব। শুধু ডিম।

দর্জি।। (স্বগতঃ) ধরা পড়িনি। (প্রকাশ্য) হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ডিম তো আপনারই। আপনার ডিম আপনাকে দেব না, সে কি কথা। সব ডিম আপনাকেই দেব।

জহুরী।। বাঃ বাঃ তাহলে এটাই চুক্তি। ডিম প্রতি একশো। বল যদি উকিল ডেকে চুক্তিপত্র করে নিতে পারি।

দর্জি।। কোন দরকার নেই। ওসবে পাঁচ কান হয়ে যাবে। আপনার আমার নীরব চুক্তি নীরবেই থাক।

জহুরী।। বাঃ বাঃ বেশ বেশ। তাহলে চলি। অসুখ বিসুখ হলে জানিও। সেরা ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাবো। সে সব খরচা আমার।

দর্জি।। ডাক্তার নিয়ে ভাববেন না। ডিম বেচা পয়সায় আমি ছেলেকেই ডাক্তার বানিয়ে দেব।

জহুরী।। সে তো ভাল কথা। খাওয়া-দাওয়ার ত্রুটি কোর না। শরীরের যত্ন নিও।

দর্জি।। শত অভাবেও খাওয়া দাওয়ার ত্রুটি করি না। শরীরের যত্ন আমার বরাবরের।

জহুরী।। তোমার না, মুরগীর।

দর্জি।। এ্যাঁ (দুজনে ফ্রিজ, অন্ধকার)

দর্জি বাড়ি

(মঞ্চের পিছন দিকে রাখা Flap-এ লেখা ভেসে ওঠে। তার আড়াল থেকে দর্জি ও জহুরী বেরিয়ে আসে। ডিম কেনা বেচা হয়। জহুরীর বয়স কমতে থাকে। দর্জির পোশাকে টাকা বাড়ার লক্ষণ। পুরোটাই মাইমের সাহায্যে হবে।)

দৃশ্য—৪

[ছ'মাস বাদে। দর্জির বাড়ি।]

দর্জি।। কই গো শুনছ? শুনতে পাচ্ছ? কালা না কি? বলি কই গো—

দর্জি বৌ।। বাড়িতে কি ডাকাত পড়ল নাকি? এত চিল্লোচ্ছ কেন? আমি কি কালা?

দর্জি।। আমারও তো সেই অনুমান।

দর্জি বৌ।। আমি হনুমান?

দর্জি।। আমি, আমি, আমি এখন হনুমানের মতোই হয়ে গেছি। ঝাঁপিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছি।

দর্জি বৌ।। আবার কোথাও বেরুবে বুঝি?

দর্জি।। হ্যাঁ একবার শান্তিপুর যেতে হবে। এক হপ্তা হয়ে গেল তাঁতিগুলো মাল পাঠাচ্ছে না।

দর্জি বৌ।। তখনই বলেছিলুম, দুটো টেলারিং শপ হয়ে গেছে, আর দোকান খুলো না।

দর্জি।। দুটো দোকানে তো তোমার চলছিল না।

দর্জি বৌ।। আহা, আমাদের মুরগী যতদিন আছে ততোদিন—

দর্জি।। মুরগী দিয়ে বেশীদিন চলবে না। জহুরী বুড়োর তো ক্রমশ বয়স কমতে কমতে কচি খোকা হচ্ছে। এরপর ডিমের দাম বাড়াতে হবে। যাক্ গে, কথা না বাড়িয়ে যা বলছি শোন। পরশু রাতে ফিরব। মুরগীটাকে নজরে রেখ।

দর্জি বৌ।। তোমার থেকেও আমি মুরগীকে বেশী নজর দিই।

দর্জি।। সে তো দেবেই। রোজগেরে মুরগীর কদর তো থাকবেই। যাক্ গে, চলি। সাবধানে থেকো।

দর্জি বৌ। দুগ্গা! দুগ্গা!

(উভয়ের প্রস্থান। জহুরীর প্রবেশ। শিশুদের মত হামাগুড়ি দিয়ে আধো আধো কথা)

জহুরী।। দদ্দি ভায়া। ও দদ্দি ভায়া। বালি আতো?

দর্জি বৌ।। (স্বগতঃ) এতো হামাগুড়ি দিচ্ছে রে! (প্রকাশ্যে) আসুন। আসুন। ওরেও বিন্দে, বাবুকে একটা চেয়ার এনে দে।

জহুরী।। লাদবে না। তেয়ালে উত্তে পালবো না। দদ্দি ভায়া কোতা?

দর্জি বৌ।। উনি শান্তিপুরে গেছেন। পরশু ফিরবেন।

জহুরী।। পন্থু? আমার ডিম দাও। এই নাও টাকা।

দর্জি বৌ।। হ্যাঁ। আপনি বসুন। আপনার ডিম এনে দিচ্ছি।

জহুরী।। লাদবে না। এলপল দিম থেলে আমি আল হামাগুলিও দিতে পালবো না।

দর্জি বৌ। সেকি! তাহলে তো আমাদের কপাল পুড়বে জহুরী সাহেব। এক কাজ করুন। আপনার তো টাকার অভাব নেই। আপনি বরং একটা মা ভাড়া করে নিন। সে আপনাকে দুধ বানিয়ে বোতলে করে খাওয়াবে, ভিজে ক্যাঁথা পাল্টে দেবে। রোদে শুইয়ে বেশ করে তেল মাখিয়ে দেবে।

জহুরী।। দ্যুৎ! কিসব বলথো।

দর্জি বৌ।। না না অসুবিধা কোথায়?

জহুরী।। বয়েথ কোমে দাখে বলে তো মনতা পাল্তে দাখে না। লদ্দাথরমের বালাই নেই।

দর্জি বৌ।। তাহলে আমাদের কি হবে জহুরী সাহবে?

জহুরী।। সেতাই তো ভাবথি। তোমাদের কথা ভেবে খুবই মন খালাপ লাদবে। এক কাত কলো। মুলদিতা আমারে দিয়ে দাও। অনেক তাকা দেব।

দর্জি বৌ।। ওনাকে জিজ্ঞেস না করে তো মুরগী দিতে পারব না।

জহুরী।। ভেবে দেখ। অনেত তাকা।

দর্জি বৌ।। কত?

জহুরী।। কতো তাও।

দর্জি বৌ।। আমি তো টাকার হিসেব জানিনে।

জহুরী।। হ্যাঁ গয়নার হিথেব তো দানো?

দর্জি বৌ।। তা জানি বৈকি।

জহুরী।। এই থলেতায় আথে।

(দর্জি বৌ থলিটা নিয়ে গয়নাগুলো দেখে নেয়।)

দর্জি বৌ।। কিন্তু আপনি তো ডিম বেচে এর থেকেও বেশী রোজগার করবেন।

জহুরী।। (হেসে) আলে না না, আমি দিম বিক্লি কলবো না। থাব। মুলগীর মান্থো থাব। তা' থাবই দথন এত্তা ভাল মুলগীল মান্থোই থাব।

দর্জি বৌ।। (স্বগতঃ) কি করি এতগুলো গয়নাগাঁটি। কিন্তু মুরগী বেচলে উনি যদি এসে রেগে যান? জহুরীর মতলবটা তো বুঝতে পারছি না। এত খরচা করে আমার মুরগী নিতে চাইছে কেন? নাঃ একটা ফন্দি করি (প্রকাশ্যে) জহুরী সাহেব এক শর্তে বেচতে পারি।

জহুরী।। কি থত্তো?

দর্জি বৌ। মাংসটা আমিই আপনাকে রেঁধে দেবো।

জহুরী।। (হেসে) বেথ্ তো। এতো ভাল তথা। আমালও থুবিদে। আমি থালে তানখান থেলে আথথি। তুমি লান্না কোলে লাথো। কিন্তু দেথো পুরোতাই দেন পাই। এক টুকলোও বাদ না দায়।

দর্জি বৌ।। আমার কথা এক। এক টুকরোও কাউকে দেবো না। আপনি চান সেরে আসুন। আমি রেঁধে রাখছি।

(মঞ্চ অন্ধকার)

জহুরী।। বাঁতালে মাসিমা।

বউ।। মাসি মা!

জহুরী।। থুলি। আথলে এত ছোথ থেলে মাসি মা নয় বললে কি মনে কলবে, তাই বললুম। আমি আথি পিথিমা। (চলে যায়)

বউ।। পিসিমা। আদিখ্যেতা। (অন্ধকার)

দৃশ্য—৫

[আলো জ্বলতেই দেখা যায়, মাংসের হাঁড়ি নিয়ে দর্জি বৌ-এর প্রবেশ।]

দর্জি বৌ।। ওঃ কি জাঁদরেল মুরগী। সেদ্ধ আর হতে চায় না, এক মণ কয়লা পুড়ে গেল। জহুরী বুড়োর শিশুর মত দাঁতে এ মাংস খেতে পারবে কিনা কে জানে। (হাঁড়ি রেখে চলে যায়। সুতোর প্রবেশ।)

সুতো। আরে বেশ গন্ধ বেরিয়েছে তো। মাংসের গন্ধ। ভালই হোল, বিদেটাও জব্বর পেয়েছে। আরে এই তো মাংসের হাঁড়ি। ওঃ জিভে জল এসে যাচ্ছে। এক টুকরো চেখে দেখি।

(হাঁড়ির ঢাকনা খুলে এক টুকরো মুখে দেয়।)

বাঃ চমৎকার। আহা সুস্বাদু মুরগী। একটা ঠ্যাং খেয়ে দেখি। নাঃ মুরগীর দুটো ঠ্যাং, একটা খেলে ধরা পড়ে যাব। বরং এই এইটা খাই (আরেক টুকরো খায়) উঃ দারুণ।

(নেপথ্যে দর্জি বৌ-এর গলা শোনা যায়—'সুতো কই গেলি রে? সুতো)

এই রে মা আসছে। কিন্তু মাংসের লোভ যে সামলাতে পারছি না। নাহ্ মাংসগুলো নিয়েই কেটে পড়ি।

(সুতো পালিয়ে যায়। জহুরী ঢোকে।)

জহুরী।। ও দদ্দি বৌ। লান্না হোলো?

(দর্জি বৌ-এর প্রবেশ)

দর্জি বৌ।। কখন হয়ে গেছে। এই যে হাঁড়ি। নিয়ে যান। আপনি পারবেন নাকি সুতো পৌঁছে দিয়ে আসবে?

জহুরী।। না না খুব পালবো (নিতে গিয়ে) পুলোতাই আথে তো?

দর্জি বৌ।। হ্যাঁ হ্যাঁ, সবটাই আছে।

জহুরী।। মুন্দু?

দর্জি বৌ।। আছে।

জহুরী।। গলা।

দর্জি বৌ।। আছে।

জহুরী।। থ্যাং?

দর্জি বৌ।। আছে।

জহুরী।। দুতোই?

দর্জি বৌ।। মুরগীর ঠ্যাং দুটো হবে না তো কি চারটে হবে?

জহুরী।। না, মিলিয়ে নিথি। বুক?

দর্জি বৌ।। বুক, পেট, ধড় এমনকি নাড়িভুঁড়িও বাদ দিইনি।

জহুরী।। থিক আছে থিক আছে মিলিয়ে নিথি থুদু।

(খুব ভারী ভেবে তুলতে গিয়ে দেখে হাল্কা লাগছে।) থব আথে তো?

দর্জি বৌ।। দূর মশাই খুলে মিলিয়ে নিন না।

জহুরী।। থিক আথে, ঠিক আথে তোমায় বিআথ করথি, পেতে দিম খিল?

দর্জি বৌ।। দূর বাপু আপনি বড় অবিশ্বেসি লোক। দিন সব মিলিয়ে দিচ্ছি।

জহুরী।। থিক আথে, থিক আথে।

(দর্জি বৌ ওর হাত থেকে হাঁড়ি কেড়ে নিয়ে হাত ঢোকাতেই মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়)

জহুরী।। কি হোল? হাতে গলম লাগলো? (দর্জি বৌ হতবাক)

(দর্জি বৌ হতাশায় আঙুল কামড়ায়) এ কি আমাল থামনেই আমাল মাংথো আপিথ করে দিও?

(হাঁড়িটা কেড়ে নিয়ে দেখে, তার চক্ষুও ছানাবড়া)

শুধু ধোল, আমাল মুলগী কোথায়?

দর্জি বৌ।। বোধহয় বেড়ালে খেয়ে গেছে।

জহুরী।। বেলাল! থব্বোনাথ। কোথায় বেলাল? আমি বেলালথুদ্ধু খেয়ে নেব।

দর্জি বৌ।। এই তো ঝোলের দাগ।

জহুরী।। এই ধোলেল দাগ ধলেই আমি খুঁদবো। আমাল মুলগী। আমাল মাংথো। আমাল বেলাল...

(চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে যায়। অন্ধকার)

দৃশ্য—৬

[আলো জ্বলতেই দেখা যায়, সুতো তারিয়ে তারিয়ে মাংস খাচ্ছে।]

সুতো।। আঃ এমন চমৎকার মাংস কোনদিন খাইনি। যেমন স্বাদ, তেমনি গন্ধ। এই হাত শুঁকে আরো সাতদিন না খেয়ে থাকতে পারি।

(জহুরীর প্রবেশ)

জহুরী।। ও এই তাহলে বেলাল। ব্যাতা বেলালেল থানা। আমার মাংথ ভক্ষণ কললি।

সুতো।। এ্যাই মুখ সামলে কথা বলো। আমার মাংস আমি খাচ্ছি।

জহুরী।। হ্যাঁ নিদের মাংস নিদে খাখ। মিথ্যুক।

সুতো।। মিথ্যুক! তুমি মিথ্যুক হ্যাংলো কোথাকার।

জহুরী।। বালে আমাল কেনা মুলগী লান্না কলতে দিয়ে তান কত্তে গেথি অমনি থেলেকে খাইয়ে দিয়ে আমায় বলে কিনা বেলালে থেয়ে গেথে। মা থেলে দুতোই মিথ্যেবাদী।

সুতো।। কি আমার মাকে মিথ্যেবাদী বললে আজ তোর একদিন কি আমার একদিন।

(সুতো জহুরীকে ধরে মারতে থাকে। জহুরী বাচ্চাদের মতো চেঁচাতে থাকে একসময় স্থির থাকে।)

সুতো।। অযথা লোককে গালাগাল দেওয়া। উচিত শিক্ষা দিয়েছি। ভাগ এখান দিয়ে (জহুরী পড়ে থাকে।)

—কি রে বাবা এ যে নড়ে চড়ে না।

(ভাল করে পরখ করে)—এ্যাঁ টেঁসে গেল নাকি! হায় হায় মরে গেল? শেষ খুন করে ফেললুম নাকি! সেরেছে এবার তো পুলিশ আসবে। নিঘাৎ ফাঁসি। ওরে বাবা। এই এলাকায় আর থেকে কাজ নেই। কেটে পড়, সুতো, দে পগারপার (সুতো দৌড়তে থাকে। মঞ্চ অন্ধকার হয়।)

দৃশ্য—৭

[আলো জ্বলতেই দেখা যায় এক প্রকান্ড মল্লবীরের ছবির সামনে একজন বক্তা দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছে। তার চিৎকারে আশেপাশের লোক জড়ো হতে থাকে। সুতোও একসময় এসে ভিড়ে মেশে।]

বক্তা।। চ্যালেঞ্জ, চ্যালেঞ্জ, ওয়ান বাই ওয়ান চ্যালেঞ্জ। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মল্লবীর। জুডো, ক্যারাটে, কুংফু, কুস্তি, বক্সিং যে-কোন লড়াইয়ে চ্যালেঞ্জ, হ্যায় কিসিকো হিম্মৎ। তো চলা আও যে এই মহাবীরকে হারাতে পারবে তাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। আইয়ে লড়িয়ে, দশ হাজার জিতে নিন। দশ হাজার নগদ পেমেন্ট। ধার বাকি নেই। আইয়ে, হিম্মৎ দিখাইয়ে। আইয়ে...আসুন....

সুতো।। আমি লড়ব।

(সুতোর চেহারা দেখে সকলে বিস্মিত হয়। 'এই বাচ্চা বসে যা' বলে সুতোকে নিরস্ত করতে থাকে। কিন্তু সুতো লড়বেই।)

বক্তা। তোর নাম কি?

সুতো।। সুতো।

বক্তা।। সুতো!

সুতো।। বাবা দর্জি। আদর করে নাম রেখেছে সুতো।

বক্তা।। কি লড়তে চাস্? জুডো, ক্যারাটে, কুংফু, কুস্তি, বক্সিং?

সুতো।। কোন্‌টার দাম বেশী?

বক্তা।। সব কটাই দশ হাজার।

সুতো।। (হিসেব করে) তার মানে পাঁচ দশে পঞ্চাশ হাজার। আমি সব ক'টাই লড়বো।

বক্তা।। এ্যাঁ।

সুতো।। হ্যাঁ, আমি ও সব কটাই জানি।

(দর্শকদের মধ্যে পথে বিপথে কথা কাটাকাটি শুরু হয়।)

বক্তা।। হারলে কিন্তু পাঁচ হাজার দিতে হবে।

সুতো।। কই সে কথা তো তুমি বক্তৃতায় বললে না।

বক্তা। বক্তৃতা আর বিজ্ঞাপনে সব কথা বলতে নেই। এটাই নিয়ম।

সুতো।। আজব নিয়ম। ঠিক আছে ঐ শর্তেও রাজী।

বক্তা।। চলো রেডি হয়ে নাও—আসুন আসুন দেখে যান। মন ভোলানো, রঙ জমানো। ফাটাফাটি লড়াই। দুই সেরা লড়াকু একই সঙ্গে লড়বে। জুডো, ক্যারাটে, কুংফু, কুস্তি ও বক্সিং। আসুন দেখে যান—শুরু হচ্ছে—এক মিনিট। আপনারা কি লড়াই দেখতে চান? (সকলে 'হ্যাঁ' বলে) দেখে কি হবে?

(সকলে—আনন্দ পাব। খুশি হব, মজা লাগবে।)

বক্তা। বহুৎ আচ্ছা। তাহলে কৌটোতে দু'টাকা করে ফেলে দিন। (কয়েকজন বেরিয়ে যায়। অনেকেই দেয়।) ঐ দেখুন কয়েকজন উৎসাহী লোক দেবার ভয়ে কেমন সরে পড়ছে। এরা শুধু নেবে কিন্তু দেবে না।

—এবার শুরু হচ্ছে, ফাইটিং। দ্য গ্রেট ফাইটিং...

(বক্তা হুইসেল দেয়। ছবিটার ভেতর থেকে মল্লবীর বেরিয়ে এসে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। শুরু হয় লড়াই। একবার মল্লবীর ধরাশায়ী হয় তো আরেকবার সুতো। এইভাবে অনেকক্ষণ লড়াইয়ের পর দুজনেই বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে।)

বক্তা।। (মল্লবীরকে) কি আর লড়তে পারবে?

(মল্লবীর সম্মতি জানায়।)

বক্তা।। (সুতোকে) তুমি?

(সুতোও সম্মতি জানায়। কিন্তু দুজনে ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দর্শকরা অনুরোধ করে লড়াই থামাবার জন্য।)

বক্তা।। বেশ, দর্শকের বিশেষ অনুরোধে মতো লড়াই এখানেই শেষ। আগামীকাল এই সময়ে আবার দেখা যাবে, এ্যাকশন রিপ্লে। কালকের দক্ষিণা মাত্র একটাকা। একটাকা। একটাকা। (অন্ধকার)

দৃশ্য—৮

[আলো জ্বলতেই দেখা যায়, সুতো অঘোরে ঘুমোচ্ছে। খুব সন্তর্পণে মল্লবীর, সেই বক্তা এবং একজন ডাক্তার প্রবেশ করে।]

বক্তা।। ব্যাটা, এত শক্তি কোথায় পেল একবার ভাল করে পরীক্ষা করে দেখুন তো ডাক্তার।

মল্লবীর।। এমন জোর আমি কোনদিন দেখিইনি। মনে হচ্ছিল এই বুঝি হেরে গেলাম।

ডাক্তার।। আস্তে তোমার গলাটাও তোমার চেহারার মতো। আস্তে কথা বলো নয়তো জেগে উঠবে।

বক্তা। এ্যাই চুপ! ডাক্তারকে পরীক্ষা করতে দাও।

(ডাক্তার নানাভাবে পরীক্ষা করার পর।)

ডাক্তার।। মাদুলি, আংটি কিছুই নেই?

মল্লবীর।। নেই? ভাল করে দেখুন।

ডাক্তার।। হিস্‌স। আস্তে।

মল্লবীর।। (ফিস্‌ফিস্ করে) ভাল করে দেখুন, লুকোনো আছে কিনা।

(ডাক্তার পুনরায় পরীক্ষা করতে থাকে।)

ডাক্তার।। নাঃ কিছু নেই। কোন কবজ-তাবিজ কিছু পাচ্ছি না।

মল্লবীর।। আপনি ডাক্তার না ওঝা, কবজ, তাবিজ, মাদুলী খুঁজছেন?

ডাক্তার।। হিস্‌স্‌ আস্তে।

বক্তা।। শরীরের ভেতর কিছু আছে কিনা দেখুন তো?

(ডাক্তার পরীক্ষা করার পর চোখ মুখ খুশিতে ভরে যায়।)

ডাক্তার।। আইব্বাস। এ যে মিরাক্‌ল।

মল্লবীর।। গ্যাঁড়াকল! তখনই বলেছিলুম গ্যাঁড়াকল্‌ আছে।

ডাক্তার।। গ্যাঁড়াকল নয়। মিরাকল্‌। মানে ঐ...এ্যা...ব্যব...ইয়ে অভাবনীয়। অকল্পনীয় ব্যাপার—

বক্তা।। মোদ্দা কথা। ব্যাপার গুরুতর।

ডাক্তার।। অধিকতর গুরুতর। এমন অবাক, হতবাক, নির্বাক ব্যাপার হয়ই না।

মল্লবীর।। ব্যাপারটা কি বলবেন তো।

ডাক্তার।। হিস্‌স্‌। আস্তে কথা বলতে পার না?

বক্তা।। ব্যাপার (গলা নামিয়ে) ব্যাপারটা খুলে বলুন।

ডাক্তার।। এর পেটের ভেতর একটা জ্যান্ত, গোটা, আস্ত মুরগী।

দু'জনে।। মুরগী!

বক্তা।। রক্ষাকবচ।

মল্লবীর।। সেটা কি?

বক্তা।। মাদুলি।

মল্লবীর।। মাদুলি দিয়ে কি করব?

ডাক্তার।। তোমার পেশীশক্তির কিছুটা যদি মগজে থাকতো তা'হলে বুঝতে পারতে, রাক্ষসের মতো খাচ্ছে আর ডাম্বেল, বারবেল ভাঁজছে। সরে দাঁড়া সরে দাঁড়া। দেখলে গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করে।

বক্তা।। মুরগীর কেসটা কি বলুন তো?

ডাক্তার।। ওটা যে সে মুরগী নয়। ঐ মুরগী যার পেটে থাকবে সে অশেষ বলবান ব্যক্তি হয়ে উঠবে। তার সঙ্গে পেরে ওঠা মুশ্‌কিল।

মল্লবীর। কেটে ফেলুন। পেট কেটে মুরগী বার করে ফেলুন।

ডাক্তার।। হিস্‌স্‌। এ্যাই ওকে এখান থেকে হঠাও। নইলে কোন কাজ করা যাবে না। পেশীবহুল গবেট কোথাকার।

বক্তা।। চুপ, মুখে আঙুল দাও। একটা কথাও বলবে না।—ডাক্তার ওর পেট থেকে মুরগীটা বার করা যায়?

ডাক্তার।। মেজর অপারেশন, দক্ষিণা কত?

বক্তা।। একশো।

ডাক্তার।। নিজে করে নাও।

বক্তা।। এ্যাই এ্যাই দুশো। আড়াইশো, তিনশো—

ডাক্তার।। পাঁচশো, গাড়ীভাড়া আলাদা চার্জ।

বক্তা।। O.K. শুরু করুন।

(ডাক্তার অপারেশন করে মুরগী বার করে আনে, মাথা, ধড়, গলা, ঠ্যাং)

বক্তা।। এ যে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

ডাক্তার।। জুড়ে দেব। জ্যান্ত হয়ে যাবে।

মল্লবীর।। মুরগীটা দেখব?

ডাক্তার।। হিস্‌স্‌ আস্তে অপারেশন চলছে।

(ডাক্তার অপারেশন শেষ করে)

ডাক্তার।। সকালেই ওর জ্ঞান ফিরে আসবে। এমন নিখুঁত অপারেশন করেছি যে ও টেরই পাবে না।

বক্তা।। বাঃ চলুন।

ডাক্তার।। অপারেশন চার্জ।

(বক্তা মুরগীর টুকরোগুলো টুপিতে ভরে মল্লবীরের হাতে দিয়ে ডাক্তারকে টাকা দেয়।)

ডাক্তার।। গাড়ীভাড়া?

বক্তা।। গাড়ীভাড়া কিসের? আমরাই তো নিয়ে এলাম। আবার পৌঁছেও দিচ্ছি।

ডাক্তার।। যাই করো। গাড়ীভাড়া চার্জ আলাদা। ওটা আমার এক্সট্রা ইনকাম।

বক্তা।। কত?

ডাক্তার।। তুমিই জান। তোমার গাড়ীতেই তো এলাম। আর তোমার গাড়িতেই যাব।

(ডাক্তারকে টাকা মিটিয়ে ওরা বেরিয়ে যায়। অন্ধকার)

দৃশ্য—৯

[পূর্বের সেই লড়াইয়ের জায়গা। সবাই বসে আছে। লড়াই শুরু হচ্ছে।]

বক্তা।। বন্ধুগণ, আজ আবার শুরু হয়ে গেছে সেই রোমহর্ষক উত্তেজক অমীমাংসিত—সুপাহিট মুকাবলা।

(বাঁশি দেওয়ার সাথে সাথে লড়াই শুরু হয়। মল্লবীর সুতোকে সহজেই হারিয়ে দেয়।)

বক্তা।। দাও হে ক্ষুদে বীর। পাঁচ হাজার ছাড়ো। কি হে ট্যাঁকে মালকড়ি নেই নাকি?

জনৈক দর্শক।। আহা বেচারাকে ছেড়ে দাও বেদম মার খেয়েছে। (অন্যান্য দর্শকরা সমর্থন করে) ছেলেমানুষ মাপ করে দাও। কাল এত ভাল লড়ল আজ কি হোল রে!

বক্তা।। জনসাধারণের বিশেষ অনুরোধে ওকে ছেড়ে দেওয়া হল। যা ব্যাটা আর ভুলেও কখনো এই এলাকায় ঢুকিস্ না। লড়তে গায়ে জোর থাকা চাই। যা ভাগ!

(সুতো পড়ে থাকে। দর্শকেরা চলে যায় নানারকম বিস্ময়সূচক কথাবার্তা বলতে বলতে।)

মল্লবীর।। পাঁচ হাজার টাকা ছেড়ে দিলে?

বক্তা।। বেশী বোকো না। ওর মাদুলি কেটে না নিলে আজ তো ওর হাল তোমার হোত হে।

মল্লবীর।। ব্যাটা পটল তুলল নাকি?

বক্তা।। মরুক গে আমাদের কি? চলো বিশ্রাম নেবে চলো।

(ওরা চলে যায়। সুতো ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়।)

সুতো।। বুঝেছি। জহুরীর মুরগীই তা হলে কাল আমায় এমন শক্তি জুগিয়েছিল? হায় বদমাশগুলো....(কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যায়।)

দৃশ্য—১০

[আলো জ্বলতেই দেখা যায় তিন চোর এক গালচে নিয়ে বচসা করছে।]

৩য় চোর (পাহারাদার)।। আমার দেশের মাল আমার ভাগেই পড়বে।

২য় চোর।। চুরির মালের দেশ-বিদেশ নেই। বখরা সমান হওয়া চাই।

৩য় চোর।। চোরেদের বুদ্ধি সবসময় তীক্ষ্ণ হয়। তোর মতো বুদ্ধুমার্কা চোর দুটি দেখিনি।

২য় চোর।। চোরেদেরও একটা ডিসিপ্লিন আছে। তুই ভাঙ্গতে পারিস না, বখরা সমান হবে।

৩য় চোর।। তোরো ঐ গালচের গুণাগুণ জানিস্ না। তাই এসব বল্‌ছিস্।

(এমন সময় সুতোর প্রবেশ)

৩য় চোর।। এসো ভাই এদিকে এসো তো (সুতোকে নিরীক্ষণ করে) আহা রে। চোখে মুখে কালশিটে পড়ে গেছে।

২য় চোর।। ধরা পড়েছিল বুঝি?

১ম চোর।। লাইনে কি নতুন? আগে তো দেখিনি।

সুতো।। কি বলছ ভাই। বুঝতে পারছি না।

২য় চোর।। পুলিশের লোক নয় তো? সেরেছে তা হলে তো ভাগ বাড়লো রে।

৩য় চোর।। অসম্ভব স্যার। এ গালচের ভাগ দেওয়া যাবে না। সরি।

সুতো।। তোমরা কি চোর?

২য় চোর।। ঠিক ধরেচে, বললাম পুলিশ।

১ম চোর।। স্যার আপনি বরং এটার সমান ভাগ করে দিন।

সুতো।। কিভাবে এটা গ্যাঁড়ালে আগে সেটা বলো।

৩য় চোর।। সবসময় যেভাবে গ্যাঁড়াই। একই কায়দা, আমি রাস্তার মোড়ে গরম গরম বক্তিমে মেরে ঘর থেকে লোক বার করে আনি। বলি শুনুন শুনুন আজ বড় দুর্দিন। আমাদের এই নেই, ওই নেই, সেই নেই। তাই আমাদের এই করতে হবে, ওই করতে হবে। সেই করতে হবে।

২য় চোর।। সেই সুযোগে আমি ফাঁকা ঘরদোরে ঢুকে পড়ে সবার মাল সাবাড় করতে থাকি। তারপর ওকে Single দিই।

সুতো। সিঙ্গেল মানে?

১ম চোর।। ওঃ অশিক্ষিত পুলিশ। সিঙ্গেল মানে হল ইশারা করা।

সুতো।। ও সিগ্‌নাল।

১ম চোর।। হ্যাঁ তারপর তল্পিতল্পা গুটিয়ে চম্পট।

সুতো। এই গালচে নিয়ে সমস্যাটা কিসের?

২য় চোর।। এটা তিনজনে একসঙ্গে ঝেড়েছি। কিন্তু ও একা ঝাড়তে চায়।

সুতো। সেই আরব দেশের গল্পের উড়ন গালিচা।

৩য় চোর।। হ্যাঁ আমিও তো এ্যারাবিয়ান।

সুতো।। গালচেখানা খোলো দেখি, ওটাকে মাপজোক করতে হবে।

৩য় চোর।। যাই করো, কাটাকাটি করা যাবে না।

(১ম ও ২য় চোর গালচে পেতে দেয়)

সুতো। এক কাজ করো। গালচেটা তিনজনের কাছেই চারমাস করে থাকুক।

১ম চোর।। এটা খারাপ বলনি।

২য় চোর।। চমৎকার হিসেব। এই না হলে পুলিশ। ভাগ বাটোয়ারায় জুড়ি নেই।

৩য় চোর।। আমারও আপত্তি নেই। তবে প্রথম চারমাস আমার কাছে থাকবে।

১ম চোর।। কেন কেন?

২য় চোর।। আমি প্রথম রাখব।

সুতো।। ঝগড়া করার দরকার নেই। (একটা ঢিল কুড়িয়ে নেয়) এই ঢিলটা ছুঁড়ছি। যে আগে এটা কুড়িয়ে আনতে পারবে সেই প্রথম রাখবে। রাজি?

সবাই।। রাজি (ওরা দৌড়াবার জন্য প্রস্তুত হয়।)

সুতো।। রেডি— সেডি— গো ও...ও...ও (ঢিল ছুঁড়ে দেয়)—চল্‌রে উড়ন গালচে।

(ওঁরা দৌড়ে বেরিয়ে যায়। সুতো উড়ন গালচে নিয়ে উড়ে যায়। অন্ধকার)

দৃশ্য—১১

[আলো জ্বলতেই দেখা যায় সুতো গালচের উপর দাঁড়িয়ে মল্লবীরকে ডাকছে।]

সুতো।। বেরিয়ে আয়। সাহস থাকে তো লড়বি আয়। বদমাশ কোথাকার। মুরগী চোর। এক ঘুসিতে তোর নাক থেবড়ে দেবো। দাঁতগুলো পটাপট্ করে ভেঙে পকেটে ঢুকিয়ে দেবো। মুরগী খাওয়ার লোভ জন্মের মতো ঘুচিয়ে দেবো। বেরিয়ে আয়—

(মল্লবীর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সুতোকে দেখে রাগে গরগর করতে থাকে।)

মল্লবীর।। ওরে বিচ্ছু। এখনো তোর শিক্ষা হয়নি। পাঁচ হাজার টাকা দান করলাম। তবুও তড়পানি। অকৃতজ্ঞ পুঁচকে ছোঁড়া। আজ তোকে চিড়েচ্যাপ্ট করে দেবো।

(সুতোকে জাপটে ধরতে যায়। সুতো পলকের মধ্যে সরে যায়। মল্লবীর গালচের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। সুতো ওর পিঠে আঙুলটাকে পিস্তলের নলের মতো চেপে ধরে গালচে উড়িয়ে দেয়। গালচে উড়তে উড়তে এক পাহাড়ের চুড়োয় থামে।

সুতো।। চলরে উড়ন গালচে—নড়লেই গুলি চালাবো।

মল্লবীর।। তো তোমার মতলবখানা কি বলো দেখি।

সুতো।। আমার মুরগী ফিরে দাও।

মল্লবীর।। দেবো কিন্তু মুরগী তো আমার বাড়িতে। সেখানে নিয়ে চলো।

সুতো।। আরো আছে। ওখানে গিয়ে স্বীকার করে নিবি তুই আমার কাছে হেরেছিস?

মল্লবীর।। নেবো। নিশ্চয়ই নেবো, বন্দুক সরাও পিঠে লাগছে।

সুতো।। তোর বাজী অনুযায়ী দশ হাজার টাকা দিবি।

মল্লবীর।। দেবো চাইলে বিশ হাজারও দেবো। এটা সরাও ভয় লাগছে।

সুতো।। এত বড় বীর পালোয়ান সামান্য বন্দুকের নলে ভয় পাচ্ছিস?

মল্লবীর।। ওটা যে আমার থেকেও শক্তিশালী।

সুতো।। বাড়ি ফিরে সব ঠিকঠাক না করলে বুঝতেই পারছিস। চোর বলেছে আমি পুলিশ। আর পুলিশ মানেই গুলি চালাতে বাধ্য হয়।

মল্লবীর।। বন্দুকটা সরাও পুলিশভাই নাহলে ভয়েতে অজ্ঞান হয়ে যাব।

সুতো।। বেশ সরিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু কোন বেগরবাই করবি না।

মল্লবীর।। কোনো বেগরবাই করবো না। মুখে আঙুল দিয়ে কান ধরে নিলডাউন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো।

(হাত সরাতেই মল্ল ঘুরে দাঁড়ায়। সুতোকে দেখে নিয়ে হঠাৎ ধাক্কা মেরে গালচে থেকে ফেলে দেয়।)

মল্লবীর।। হাঃ হাঃ হাঃ মগজে আমার এখনো ঘিলু আছে। হাঃ হাঃ হাঃ এই পাহাড়ের উপর এখন পচে মর কেউ বাঁচাতে আসবে না। চল রে উড়ন গালচে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

(মল্লবীর হাসতে হাসতে গালচে নিয়ে উড়ে যায়। সুতো পাহাড় থেকে গড়াতে গড়াতে পড়তে থাকে। অন্ধকার।)

দৃশ্য—১২

[আলো জ্বলতেই দেখা যায় জঙ্গল। সুতো জঙ্গলের মধ্যে ক্লান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।]

সুতো।। পাহাড় বেয়ে জঙ্গলে এসে পড়লাম। একজন মানুষেরও দেখা পেলাম না। কবে যে লোকালয়ে পৌঁছতে পারব কে জানে। (হঠাৎ গাছে খেজুর দেখে) বাঃ চমৎকার খেজুর ঝুলছে। আহা! এমন বড় বড় সুন্দর খেজুর খুব কমই দেখা যায়। খেজুর দেখে খিদেটাও বেড়ে গেল।

(হলদে খেজুর গাছের সামনে যায় এবং একটা খেজুর পেড়ে খায়।) আহ্! চমৎকার এমন মিষ্টি রসালো খেজুর জীবনেও খাইনি। (একটা পা মাটিতে আটকে যায়।) এ্যাই পা-টা মাটিতে গেঁথে গেল কেন? (আরেকটা খেজুর খায়)

—আরে এ পাটাও যে আটকে গেল। (আরেকটা খেজুর খায়) —এ কিরে এই হাত যে নড়ছে না। না নড়ুক এ খেজুরগুলো আমি সাফ করবই। (আরেকটা খায়)

—সাড়ে সব্বোনাশ এ যে স্ট্যাচু হয়ে গেলাম। হায় হায় খেজুরের লোভে পড়ে এ আমি কি করলাম। (কাঁদতে থাকে)

(সুতো কাঁদতে থাকে। এমন সময় এক জংলী মানুষ ঢোকে। সুতোকে ভালভাবে দেখতে থাকে।)

সুতো।। এটা আবার কেরে। মানুষের মতই তো দেখতে।

(জংলীটা ওকে দেখতে থাকে।)

—মেরেছে। ড্যাবডেবিয়ে দেখছে কেমন, খাবে নাকি! জঙ্গলে বাঘ-ভাল্লুকের খপ্পরে পড়লাম না। পড়লাম মানুষখেকো মানুষের খপ্পরে?

জংলী।। মানুষ!

সুতো।। না বাঁদর। তুমি বুঝি মানুষের মাংস খেতে ভালবাস?

(জংলী হাসতে থাকে)

সুতো।। হাসছে, সব্বোনাশ এবার ঠিক কামড়াবে।

জংলী।। না, আমি কোনো মাংসই খাই না, ফলাহার করি।

সুতো।। ফলাহার? খবরদার খেজুর খেয়ো না।

জংলী।। (হেসে) খেজুর খেলে কিছু হয় না, শুধু চিনে খেতে হয়। তোমাকে দেখেই বুঝতে পেরেছি তুমি কিচ্ছু চেন না। তা তুমি এই জঙ্গলে এলে কিভাবে?

(সুতো তাকে সব বৃত্তান্ত বলে। জংলী সব শোনে।)

—বুঝলাম, জীবনে তুমি কিছুই সঠিক চিনতে পারনি। তাই তোমার এই দশা। তুমি নেহাৎই বাচ্চা ছেলে তাই পদে পদে ভুল করেছো। দাঁড়াও আগে তোমাকে মুক্ত করি—এই নাও এই ধূসর বিবর্ণ খেজুর খেয়ে দেখো।

(পাশের ধূসর রঙের খেজুর পেড়ে একটা একটা করে সুতোকে খাওয়াতে থাকে। সুতোর একে একে হাত-পা সব ছাড়িয়ে ফেলতে পারে।)

জংলী।। শোনো, বাইরের রঙ আর চটক দেখেই লোভে পড়ে যেও না। সোনা পেতল, কাঁচ-হীরে চিনতে শেখো। চিনতে শেখো বাইরেটার সঙ্গে ভেতরটাও। চিনতে পারলে তাকে যত্ন করে ধরে রেখো। যাকে মুরগী ভেবেছো ওটা আসলে এক বিরল প্রজাতির বুনো পাখী। ও প্রকৃতির সম্পদ। ওকে প্রকৃতির সঙ্গে থাকতে দেওয়াই উচিত। তোমরা ওর শক্তির অপব্যবহার করেছো। প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট করলে পৃথিবীও ধ্বংস হয়ে যাবে। তোমাকে আমি উপায় বলে দিচ্ছি তুমি ঐ পাখী উদ্ধার করে জঙ্গলে ছেড়ে দাও।

সুতো।। তোমায় কথা দিচ্ছি। ঐ পাখী উদ্ধার করে আমি প্রকৃতির মধ্যেই ছেড়ে দেব। তুমি এখান থেকে বেরোবার রাস্তা বলে দাও।

জংলী।। এসো আমার সঙ্গে। (অন্ধকার)

দৃশ্য—১৩

[আলো জ্বলতেই দেখা যায়। পূর্বের সেই লড়াইয়ের জায়গা, মল্লবীর ও সুতো লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। চারপাশে দর্শকবৃন্দ।]

বক্তা।। বন্ধুগণ, এবার কিন্তু হারলে ওকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা দিতেই হবে।

দর্শকরা।। হ্যাঁ হ্যাঁ, বার বার ছাড়া যাবে না।

সুতো।। লড়াই শুরু করো। আমি রাজি।

বক্তা।। শুরু হচ্ছে দ্য গ্রেট ফাইটিং মুকাবলা।

(বাঁশি দেয়। লড়াই শুরু হয়। সুতো সময় বুঝে মল্লবীরের মুখে হলদে খেজুর গুঁজে দেয়। মল্লবীর স্ট্যাচু হয়ে যায়। খানিকক্ষণ একতরফা মেরে আবার ধূসর রঙের খেজুর মুখে ঢুকিয়ে দিলে মল্লবীর লড়তে থাকে। এইভাবে কিছুক্ষণ মজা করে। অনেকগুলো হলদে খেজুর খাইয়ে ওকে ঘায়েল করে ফেলে।)

মল্লবীর।। আর পারছি না, আমি হেরে গেছি।

(দর্শকরা উল্লাস দেখায়।)

সুতো।। আমার মুরগী ফেরৎ দে।

মল্লবীর।। ওর মুরগী দিয়ে দাও।

বক্তা।। কিসের মুরগী? ওর প্রাপ্য দশ হাজার দিয়ে দিচ্ছি ব্যস।

সুতো।। এক পয়সাও লাগবে না। শুধু মুরগী চাই—

(দর্শকরা বিভ্রান্ত হয়। কিসের মুরগী কার মুরগী জানতে চায়।)

সুতো।। আগে মুরগী দিক্ তারপর সব বলছি।

(দর্শকরা চেপে ধরে মুরগী ফেরত দেবার জন্য। অবশেষে বক্তা মুরগী এনে সুতোকে দেয়। সুতো খুশি হয়ে ধূসর রঙের খেজুর খাইয়ে মল্লবীরকে সুস্থ করে। এমন সময় দর্জি, দর্জি বৌ ও জহুরী ঢোকে।)

দর্জি।। ঐ তো সুতো।

দর্জি বৌ।। ওর হাতে সেই মুরগী—

জহুরী।। আমাল মুলগী।

(ওরা তিনজনে সুতোর দিকে ধেয়ে আসে। বক্তা ও মল্লবীর বাধা দেয়।)

মল্লবীর।। খর্বদার, এ মুরগী ছোঁবে না, এটা আমার।

বক্তা।। আমাদের মুরগী।

দর্জি।। চুপ কর, ব্যাটা না জেনে মন্তব্য করিস্ না।

জহুরী।। ও তা আমাল মুলগী। আমি কিনেথি।

(সকলেই 'আমার' আমার মুরগী বলতে বলতে সুতোকে ঘিরে ধরে। সুতো চিৎকার করে ওঠে।)

সুতো।। না এ তোমাদের মুরগী নয়, বিরল প্রজাতির পাখী এ প্রকৃতির সম্পদ। জঙ্গলের মানুষ আমায় সব বলেছে। আমি একে প্রকৃতির মধ্যেই ছেড়ে দেব।

(সকলে সুতোকে তাড়া করে। হৈ হট্টগোলের মধ্যে সুতো মুরগীটা আগলে নিয়ে পালাতে থাকে। সবাই ওর পিছু নেয়। একসময় সুতো পাখীটা আকাশে উড়িয়ে দেয়। সকলে স্থির হয়ে দেখতে থাকে। সুতোর মুখে আনন্দের হাসি। পাখীটা উড়তে উড়তে আকাশে মিলিয়ে যায়। মূল পর্দা নেমে আসে।)

ছবি: অভীক কুমার মৈত্র

একটি ভূতের গল্প

ঋক ধর্মপাল ব্যানার্জী

গ্রাহক নং ৪১২১, বয়স ১০ বছর

সেদিন একটা বিখ্যাত নাটক হবে পালেদের মাঠে মঞ্চ তৈরী করে। আমার খুব ইচ্ছে নাটকটা দেখতে যাওয়ার। কিন্তু আমার মা বারণ করল। মা বলল—'আজকে যাস না খোকা, আজ রাত্তিরে ঝড় উঠবে মনে হচ্ছে, দেখছিস না, পিঁপড়েরা ডিম মুখে সারি সারি নিরাপদ আস্তানার খোঁজে বেরিয়েছে?'

সন্ধ্যেবেলায় আমি মা-র কথা না শুনে একটা ঝালমুড়ির ঠোঙা নিয়ে খেতে খেতে মাঠের দিকে চললাম। যথাসময়ে নাটক শুরু হল, বেশ মজা পাচ্ছি। কিন্তু নাটক দেখতে দেখতে মেঘ ঘনিয়ে এল। একটু পরেই শুরু হল এলোপাথাড়ি বৃষ্টি, সঙ্গে তুমুল ঝড় উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই চেয়ার উল্টোতে শুরু করল, মঞ্চের মাথার সামিয়ানা উড়ে গেল। কখন হাত থেকে ঝালমুড়ির ঠোঙা পড়ে গেছে, জানি না। ঝড়ের তান্ডব থেকে কোনরকমে চোখ মুখ বাঁচিয়ে ভিজতে ভিজতে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলাম।

একটু পর হঠাৎ লক্ষ্য করলাম একজন লোক ভিজতে ভিজতে ঠিক আমার পেছন পেছন হেঁটে আসছে। লোকটার সর্বাঙ্গ সাদা কাপড়ে মোড়া, এমন কি মুখটাও কাপড়ের আড়ালে ঢাকা। লোকটিকে দেখে মনে যেন একটু সাহস পেলাম। হাঁটার গতি একটু কমিয়ে লোকটির সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলাম।

একসঙ্গে চলতে চলতে বেশ আলাপও হল। একটুবাদেই আমাদের বেশ খিদে পেয়ে গেল। দেখলাম ওই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেও একটা চায়ের দোকান খোলা আছে। আমি তখন

ওই লোকটিকে বললাম— আপনি সামনে বটগাছের তলায় অপেক্ষা করুন, আমি চা বিস্কুট নিয়ে আসছি।'

চায়ের দোকানটা একটু দূরে ছিল। চা নিয়ে যখন ফিরে এলাম, দেখলাম যে লোকটা গাছের তলায় একইভাবে বসে। আমি যতই বটগাছের দিকে এগোতে লাগলাম, ততই অনুভব করলাম বটগাছ সমেত লোকটা যেন পিছোচ্ছে। আমি দৌড়ে এগোতে চেষ্টা করলাম, হাত থেকে চায়ের ভাঁড়দুটো পড়ে গেল! সেদিকে না তাকিয়ে আবার দৌড়োলাম, বটগাছটা একটু যেন কাছে এল; যেই হাত বাড়িয়ে লোকটিকে ছোঁয়ার চেষ্টা করেছি, অমনি দেখতে পেলাম—লোকটার জায়গায় যেন একটা সাদা কঙ্কাল পড়ে আছে।

পেছন ফিরে পালাতে গিয়ে একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। কোনরকমে উঠে দেখলাম কঙ্কালটি নেই এবং একটি পোড়া বটগাছ দাঁড়িয়ে আছে।

তারপর থেকে এই ভূতুড়ে উপদ্রবের কথা মাঝে মাঝেই শোনা যেতে লাগল। অনেকেই নাকি ওই বটগাছটাকে জীবন্ত দেখতে পেয়েছে এবং একজন সাদা কাপড়ে মোড়া লোককে তার তলায় বসে থাকতে দেখেছে।

বৃষ্টি

বৃতি দাশ

বয়স ৭ । গ্রাহক সংখ্যা ৫১১৬

বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি
আমরা খাব মিষ্টি
ছাতা নিয়ে যাব বাড়ি
যদি না আসে মোর গাড়ি।

EMTA GROUP of Companies,
a multi-business conglomerate
and having core competence
in captive coal mining
for the thermal power stations
across the country.

THE POWER BEHIND POWER

EMTA Group of Companies

Kolkata: 801, Central Plaza, 2/6, Sarat Bose Road, Kolkata 700 020, Ph: 033 2485 8510/2485 8559, Fax : 033 2485 8513, e-mail : emta@cal2.vsnl.net.in
Delhi: 6 Poorvi Marg, Vasant Vihar, New Delhi 110 057, Ph : 011 4107 4107, Fax : 011 4166 2808, e-mail : emta@ndc.vsnl.net.in
Bangalore : 301 Regency Enclave, 4 Magrath Road, Bangalore 560 025

SPS/Emta/05

R.N.I. No. 120074/64 SANDESH August 2008 Rs. 15/-

আরামবাগস্

ব্রয়লার মুরগী সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ

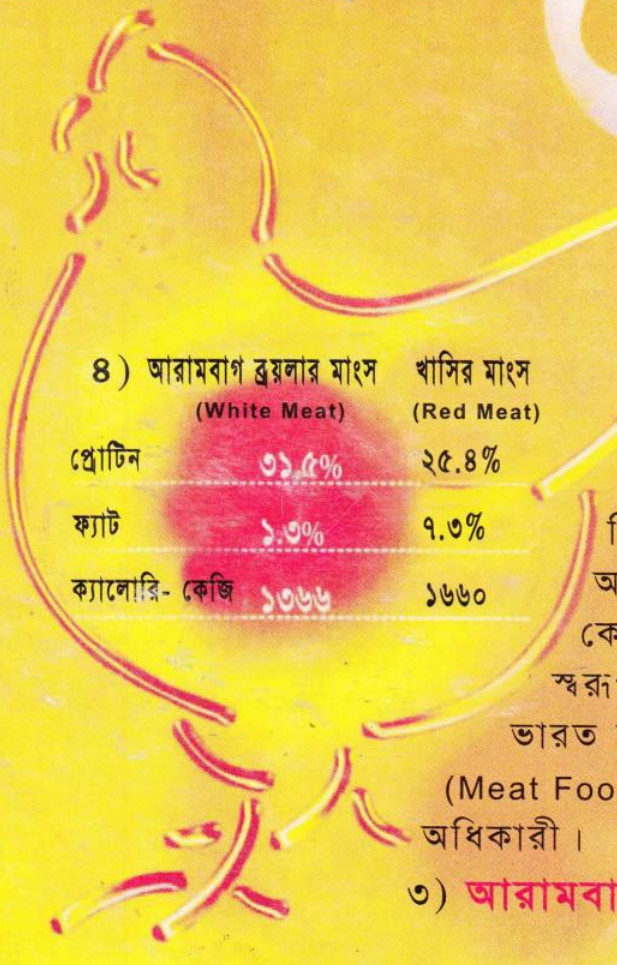

১) আরামবাগ ব্রয়লার মুরগীর মাংসের মাধ্যমে প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেড ইত্যাদি প্রয়োজনীয় উপাদান পাওয়া যায়। আজকে আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা পুষ্টি, যার সমস্যা সমাধানের আরামবাগ ব্রয়লার মুরগী একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

২) আরামবাগ চিকেন বিশ্বমানের তুল্য। পৃথিবী বিখ্যাত সুইস কোম্পানী S.G.S. এর তত্ত্বাবধানে আরামবাগ চিকেন উৎপাদন করা হয়। ভারতীয় কোম্পানী হিসাবে শুধুমাত্র আরামবাগ এই স্বীকৃতি স্বরূপ HACCP ও SQF Certificate পেয়েছে এবং ভারত সরকারের গুণগত মান নির্ধারক সংস্থা MFPO (Meat Food Products Control Order) এর Licence এর অধিকারী।

৩) আরামবাগ আপনাদের সেবায়--

সঠিক মান

সুস্বাদু

তাজা

৪)

	আরামবাগ ব্রয়লার মাংস (White Meat)	খাসির মাংস (Red Meat)
প্রোটিন	৩১.৫%	২৫.৪%
ফ্যাট	১.৩%	৭.৩%
ক্যালোরি- কেজি	১৩৬৬	১৬৬০

SGS

SQF 2000 HACCP QUALITY CERTIFIED SUPPLIER

SQF stands for - Safe Quality Food
HACCP stands for - Hazard Analysis & Critical control Points

Adda Bites...

Arambagh's FOOD MART

Arambagh's chicken

Arambagh Hatcheries Ltd.
59B Chowringhee Road, Kolkata 700 020
Phone : 2283 2588/2527/2536/2522/2601/2603
Fax : 91-33-22832552
E-Mail No. : arambagh@cal.vsnl.net.in